পঠন সেতু

পরিবেশ
ও
বিজ্ঞান

পরিবেশ
ও
ইতিহাস

পরিবেশ
ও
ভূগোল

অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । বিশেষজ্ঞ কমিটি ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান
পরিবেশ ও ইতিহাস
পরিবেশ ও ভূগোল

অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্রিজ মেটিরিয়াল 'পঠন সেতু' প্রকাশিত হল। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নেবেন এবং 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই প্রত্যাশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০২১
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের জন্য 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে — এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় নির্মাণ, সম্পাদনা ও বিন্যাস

îo˜#œ ö‡y¡ রাজীব কুমার কর ড. ধীমান বসু

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	বল ও চাপ	1
2.	স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল	5
3.	পদার্থের প্রকৃতি	10
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	21
4.	পদার্থের গঠন	22
5.	জীবদেহের গঠন	34
6.	মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন	44
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	59

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 বল ও চাপ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বল পরিমাপের জন্য স্প্রিং তুলার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্থির অবস্থার ও গতিশীল অবস্থার ঘর্ষণের পার্থক্য করতে পারবে।
- কোনো প্রদত্ত তলের উপর তরলের চাপের মান নির্ণয় করতে পারবে।
- তরলের চাপের প্রভাবক সমূহ উল্লেখ করতে পারবে।
- প্লবতা কী তা আলোচনা করতে পারবে।
- তরলে কোনো বস্তুর ভাসনের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

বল ও তার পরিমাপ

স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনতে বা গতির বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাতে বা গতির দিক পরিবর্তন করতে বস্তুর উপর যা প্রয়োগ করা হয় তাকেই আমরা বল বলি। বল ও গতি বিষয়ে স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন যার থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারি :

- প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি একটি বস্তুর ওপর কোনো বল কাজ করছে কি না তা বুঝতে পারা যাবে যদি বস্তুটির বেগ পরিবর্তিত হয়।
- দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করা বল যত বেশি হবে বেগ পরিবর্তনের হারও অর্থাৎ ত্বরণও তত বেশি হবে।
- তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা এটা বুঝেছি যে যখন একটি বস্তু অন্য কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর উলটো দিকে সম মানের বল প্রয়োগ করে। এই দুটি বলের একটিকে যদি বলি ক্রিয়া তবে অন্যটিকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া।

কোনো ভৌতরাশির সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার জন্য তার দুটি দিক বিশ্লেষণ করা দরকার—

1 গুণগত পর্যালোচনা (qualitative analysis) যেখানে ভৌতরাশির ধর্ম, বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

2. পরিমাণগত আলোচনা (quantitative analysis) এখানে ভৌত রাশির গাণিতিক পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আমরা বলের গুণগত আলোচনা করেছি, এইবার পরিমাণগত আলোচনা করব।

নিউটনের বলের গতিসূত্র থেকে আমরা জানি : **বল (Force) = বস্তুর ভর × উৎপন্ন ত্বরণ,** অর্থাৎ $F = m \times a$ যেখানে **m** হলো বস্তুর ভর এবং **a** হলো বস্তুর ত্বরণ।

এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা জানতে পারব কত পরিমাণ বল কত পরিমাণ ভর এবং ত্বরণের প্রভাবে উৎপন্ন হতে পারে।

বল ত্বরণের উপর নির্ভরশীল যা বেগ পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করে। বেগ একটি দিক-নির্ভর ভৌতরাশি, তাই বলও একটি দিক-নির্ভর ভৌত রাশি। যে সমস্ত ভৌতরাশি দিক-নির্ভর তাদের ভেক্টর রাশি (vector quantity) বলা হয়। বল মাপার যন্ত্রের নাম স্প্রিং তুলা বা spring balance। বলের প্রভাবে বস্তুর আকৃতি পরিবর্তিত হয়। স্প্রিং-এর আকৃতি পরিবর্তনকে (এক্ষেত্রে প্রসারণ) কাজে লাগিয়ে প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করা হয়।

ঘর্ষণ বল ও তার পরিমাপ

যখন একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সংস্পর্শে থেকে গতিশীল হয়, বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন বস্তুদ্বয়ের

স্পর্শতলে একটি বলের উদ্ভব হয় যা বস্তুটির গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে। এই বলকেই ঘর্ষণ বল বলা হয়। ঘর্ষণ বল দুটি তলের (সেটি সম পদার্থের হতে পারে আবার নাও হতে পারে) সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। দুটি বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন এই ঘর্ষণকে স্থির ঘর্ষণ এবং গতিশীল অবস্থায় ঘর্ষণ বলকে গতির ঘর্ষণ বলে।

ঘর্ষণ বলের বৈশিষ্ট্য :

ধরা যাক মাটিতে চেয়ার বা টেবিল রাখা আছে। আমাদের উদ্দেশ্য সেটিকে গতিশীল করে স্থানান্তরিত করা।

এক্ষেত্রে কি করণীয় ? নিশ্চয়ই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী বল প্রয়োগ করব। এরকম কিন্তু হবে না যে বল সামান্য প্রয়োগে বস্তুটি স্থানান্তরিত হবে। তার মানে অল্প পরিমাণ বল প্রয়োগে টেবিলটি সরবে না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি বল প্রযুক্ত হলে তবেই বস্তুটি স্থানান্তরিত হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি নির্দিষ্ট সীমা অবধি বল প্রয়োগ করলেও বস্তুটি গতিশীল হয় না। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একটি বলও বস্তুর ওপর পূর্বেই ক্রিয়া করছে এবং এই বল বস্তুটিকে গতিশীল হতে বাধা দিচ্ছে। তবে আমাদের প্রযুক্ত বলের পরিমাণ যখন অনেক বেশি, তখন ঘর্ষণ বল থাকা সত্ত্বেও বস্তুটি গতিশীল হয়। যদি টেবিলের ওপরে কোনো ভারী বস্তু রাখা হয় তখন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে টেবিলটিকে সরাতে আগের চেয়ে বেশি বল প্রয়োজন হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে কোনো তলের ওপর রাখা বস্তুর ওজন যত বাড়বে তলের সঙ্গে বস্তুটির ঘর্ষণ বলও তত বেশি হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে **ঘর্ষণ বল দুটি তলের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় এবং বস্তুর গতিশীলতাকে বাধা দেয়।**

স্থির অবস্থায় ঘর্ষণ বলের একটি সর্বোচ্চ মান আছে। এই সর্বোচ্চ মান একটি বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট তলের ওপর থাকার সময় সর্বদা একই থাকে। স্থিত ঘর্ষণের সীমাস্থ মান গতীয় ঘর্ষণের মানের চেয়ে বেশি হয়।

তরলের ঘনত্ব ও চাপ

একই রকমের দুটি বোতলে সম আয়তনের দুটি ভিন্ন তরল স্প্রিং তুলার সাহায্যে ওজন করলে ভিন্ন ওজন পাওয়া যাবে। এর মূল কারণ হলো পদার্থ দুটির ঘনত্বের পার্থক্য আছে। তাই দুটি বোতলে তরলের আয়তন এক হলেও তাদের ভর আলাদা হয়। ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই ঘনত্ব। একক আয়তনে বস্তুর ভরকে বলে ঘনত্ব। তাই সম আয়তন বিশুদ্ধ জলের তুলনায় পারদ প্রায় 13.6 গুণ ভারী। অর্থাৎ 1 ঘনসেমি বিশুদ্ধ জলের ভর 1 গ্রাম থাকলে 1 ঘনসেমি আয়তনে পারদ থাকবে 13·6 গ্রাম। তাই আমরা বলি পারদের ঘনত্ব 13·6 গ্রাম প্রতি ঘনসেমি।

চাপ ও বল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একই পরিমাণ বল যদি আমরা একটি স্কেল ও সূচের উপর প্রয়োগ করি, তবে তার ফলাফল এক হবে না। সূচ মানুষের ত্বক ভেদ করবে কিন্তু স্কেল তা করবে না। এর মূল কারণ চাপের পার্থক্য। সূচের মাথার ক্ষেত্রফল কম বলে সৃষ্ট চাপের মান অনেক বেশি, স্কেলের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় সৃষ্ট চাপের মান অনেক কম।

অর্থাৎ **চাপ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : বল ও ক্ষেত্রফল।**

চাপ হলো একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত লম্বভাবে ক্রিয়াশীল বল, অর্থাৎ চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

তরলের চাপ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

1. **উচ্চতা বা গভীরতা :** এখানে উচ্চতা মানে কত উঁচু সেটা মাপা হচ্ছে তা নয়। যেখানে চাপ মাপা হচ্ছে তার উপর কত উচ্চতায় তরল আছে অর্থাৎ তরলের উপরের তল থেকে ঐ বিন্দুর গভীরতা।
2. **তরলের ঘনত্ব :** ঘনত্ব বেশি হলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল বেশি হবে অর্থাৎ চাপ বেশি হবে।
3. **অভিকর্ষজ ত্বরণ :** পৃথিবীতে কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের উপর নির্ভর করে। তাই তরল কর্তৃক প্রযুক্ত চাপ ও অভিকর্ষজ ত্বরণের সঙ্গে সরল সম্পর্কযুক্ত।

h গভীরতায় তরলের চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি তরলকে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি চোঙাকৃতি পাত্রে রাখা হয় তবে h গভীরতার যে পরিমাণ তরল থাকে তাকে পৃথিবী যে বলে টানে তা হবে প্রযুক্ত বল।

বল = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ

= (আয়তন × ঘনত্ব) × অভিকর্ষজ ত্বরণ

= (উচ্চতা × ক্ষেত্রফল × ঘনত্ব) × অভিকর্ষজ ত্বরণ

$\therefore$ চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

$= \frac{\text{উচ্চতা} \times \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{ঘনত্ব} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

= উচ্চতা × ঘনত্ব × অভিকর্ষজ ত্বরণ

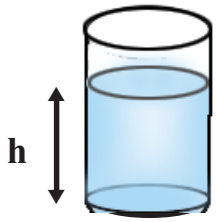

চোঙাকৃতি পাত্রে রাখা তরল

ইতালির বিজ্ঞানী টরিসেলি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু যে চাপ দেয় তা 76 সেমি উঁচু পারদস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় তার সমান।

বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিডিসের নীতি

যখন কোন বস্তুকে কোন তরলে ডোবানো হয় তখন ওই তরল বস্তুটির ওপর একটি উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। এই বলটিকে প্লবতা বলা হয়।

আর্কিমিডিসের নীতি :

একটি বস্তুকে কোনো তরলে আংশিক বা পূর্ণ ডোবালে ঐ বস্তুটি কিছুটা তরলকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় ও নিজে সেই জায়গা দখল করে। বস্তুটিকে জায়গা দিতে গিয়ে যতটা তরল নিজের জায়গা থেকে সরে গেল সেই পরিমাণ তরলের ওজন যত বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া উর্ধ্বমুখী বলের (প্লবতা) মানও তত।

একটি বস্তুকে সুতোয় ঝুলিয়ে সেটিকে একটি তরলে তিনভাবে ডোবানো হলো।
পাশের চিত্রগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

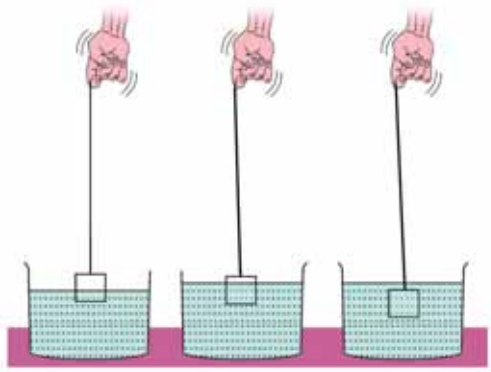

- **পাশের কোন চিত্রের ক্ষেত্রে ডোবানো বস্তুটি বেশি তরলকে অপসারিত করেছে, অর্থাৎ বেশি তরলকে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে?**
- **কোন চিত্রটির ক্ষেত্রে বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া প্লবতার মান বেশি?**

পাশের ছবি দুটি ভালো করে দেখো ও তা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একই বস্তু D-কে দুটি আলাদা আলাদা তরলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুটি তরলেই বস্তুটি ভাসে। অর্থাৎ বস্তুটির ওপর মোট বলের পরিমাণ দুটি তরলের ক্ষেত্রেই শূন্য।

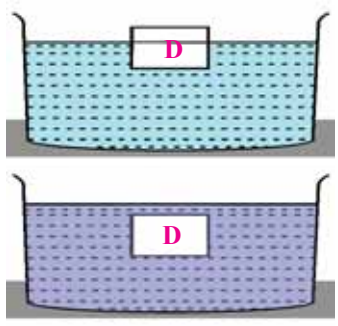

- বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন কোন ক্ষেত্রে বেশি?
- বস্তুটির ওপর কোন তরলটি বেশি ঊর্ধ্বমুখী বল (প্লবতা) প্রয়োগ করেছে? না কি দুটি তরলই সমান প্লবতা প্রয়োগ করেছে?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন বেশি?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ভর বেশি?
- তোমরা আগে জেনেছ যে, আয়তন × ঘনত্ব = ভর।
- এবার বলোতো উপরের ছবি দুটির কোন তরলটির ঘনত্ব বেশি?

তাহলে বোঝা গেল যে, **কোনো তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ওপর ওই তরলটি কত ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তা নির্ভর করে ওই বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন ও ওই তরলটির ঘনত্বের ওপর।**

এবার নীচের প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একটি ছোটো পেরেকের টুকরো বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়, অথচ, পেরেকের চাইতে অনেক ভারী একটি স্টিলের বাটি বালতির জলে ভাসে। কেন?

তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ব্যাপারে আমরা যা যা শিখলাম, তা হলো—

কোনো বস্তুকে কোনো তরলে ডোবালে ওই বস্তুটি কিছুটা তরলকে অপসারিত করে। অপসারিত তরলের ওজনের মান, বস্তুর ওপরে তরলের দেওয়া ঊর্ধ্বমুখী বলের মানের সমান।

কোনো বস্তু যখন কোনো তরলে ভাসে তখন বস্তুর ওজনের মান এবং বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের মান সমান হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- বল একটি দিক-নির্ভর অর্থাৎ ভেক্টর রাশি। তাই বলের মান ও কোনদিকে তা ক্রিয়াশীল দুটিই বিচার করতে হবে।
- ঘর্ষণ বল দুটি তলের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় এবং গতিশীলতাকে বাধা দেয়।
- তরলের চাপ নির্ভর করে তরলের গভীরতা, ঘনত্ব ও অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের উপর।
- স্থির অবস্থায় কোনো তরলে ভাসমান বস্তুর ওজন ও ঊর্ধ্বমুখী প্লবতার মান সমান ও একই বিন্দু দিয়ে ক্রিয়াশীল।
- কোনো তরলে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল প্লবতার মান তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে অষ্টম শ্রেণির 'বল ও চাপ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

চাপের SI এককটি হলো — ক) নিউটন খ) নিউটন/মিটার গ) নিউটন/বর্গমিটার ঘ) ডাইন/বর্গসেন্টিমিটার।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

একটি চোঙাকৃতির ড্রামের তলদেশে জলের চাপ _____ হবে যদি ড্রামের অর্ধেক জল বার করা হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ একই উচ্চতার পারদ স্তম্ভ ও জল স্তম্ভের চাপ সমান।

৩.২ জলে স্থির অবস্থায় ভাসমান বস্তুর ওজন ও বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল প্লবতার মান সমান।

৪. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ এক লিটার জল ও এক লিটার গাঢ় নুনজলের মধ্যে কোনটি 10 বর্গসেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলে বেশি চাপ প্রয়োগ করবে? কেন?

৪.২ একটি পেনের পিছনের দিক অপেক্ষা নিবের সাহায্যে সহজেই একটি কাগজে ছিদ্র করা যায় — ব্যাখ্যা করো।

2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা দুটি নির্দিষ্ট ভরবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের মান নির্ণয় করতে পারবে।
- অভিকর্ষজ ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে ও কেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার মান ভিন্ন ভিন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সূত্রাবলীর ধারণা উল্লেখ করতে পারবে।
- পৃথিবীর চারদিকে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণন মহাকর্ষীয় বলের ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ট্রিবোইলেকট্রিক সিরিজ ব্যবহার করতে এবং ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তু কেন তড়িতাহিত হয়ে পড়ে ও তড়িতাবেশের কারণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্থির তড়িৎ বলের প্রভাবে কীভাবে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে তার বর্ণনা করতে পারবে।

আমরা জানি, একটা বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর কোনো এক বলের (Force) টানে নীচের দিকে নামে, এই বলটি হলো অভিকর্ষ বল। পৃথিবী সব বস্তুকেই অভিকর্ষ বল দিয়ে টানে। তাহলে বলা চলে পৃথিবী ও পৃথিবীর আশেপাশে থাকা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে তারই নাম অভিকর্ষ। আবার মহাকর্ষ বল হলো এ বিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকণা তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একে অন্যকে যে সমান বলে আকর্ষণ করে তার মান। আসলে অভিকর্ষও একটি মহাকর্ষ বল।

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ বলের মান যে গাণিতিক সম্পর্ক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তা হলো

$$F = G \cdot \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

এখানে F = মহাকর্ষ বল, m_1 ও m_2 বস্তু দুটির ভর, d = বস্তুকণাদুটির মধ্যে সরলরেখা বরাবর দূরত্ব। 'G' হলো সর্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক', কারণ G- এর মান মহাবিশ্বে সব জায়গায় একই থাকে, মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না।

SI পদ্ধতিতে G -এর একক হলো $\frac{\text{নিউটন} \times \text{মিটার}^2}{\text{কেজি}^2}$ বা $\frac{N \times m^2}{kg^2}$

এর পরীক্ষালব্ধ মান হলো $G = 6{\cdot}67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$

গাণিতিক বিচারে কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে তা প্রায় অনুভূতির বাইরে চলে যায়। তাই সেই দূরত্বের পর মহাকর্ষীয় প্রভাব নেই বলে ধরা যায়। কোনো বস্তুকে ন্যূনতম 11·2 km/s বেগে পৃথিবীর থেকে ওপর দিকে ছোড়া হলে তা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যায়। এই বেগকে বলা হয় মুক্তি বেগ।

- গোলক আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে তার জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দুতে ওই বস্তুর সমস্ত ভর জমা আছে ধরে মহাকর্ষ বল হিসাব করা হয় এবং যেহেতু পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহ সবই প্রায় গোলকাকার। তাই পৃথিবীর বাইরে যেকোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বল নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুকণার দূরত্বকে মহাকর্ষ বলের মান নির্ণয়ের d এর মান ধরা হয়।
- এই বিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে সরলরেখা বরাবর আকর্ষণ করে, কিন্তু পৃথিবীর ওপর প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে অন্য সব বস্তুর ঠোকাঠুকি লাগে না। এর কারণ হলো পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা বস্তু দুটিকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে টানে তার তুলনায় বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল পারস্পরিক আকর্ষণ বল এতটাই কম যে তার কোন প্রভাব বাস্তবে বোঝা যায় না।

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে অবাধে পতনশীল কোনো বস্তুতে যে ত্বরণের সৃষ্টি হয় তাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়।

নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী, বল (F) = ভর (m) × ত্বরণ (a) অর্থাৎ $F = m \times a$ বা, $\frac{G\,m\,M}{R^2} = m \times a$

(পূর্বের সূত্র অনুযায়ী, আমরা জানি পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকা m ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষজ বলের মান $\frac{GmM}{R^2}$ যেখানে, M = পৃথিবীর ভর, R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ)

অতএব অভিকর্ষজ ত্বরণের মান হলো $a = \frac{GM}{R^2} = g$

এ থেকে বোঝা গেল, একক ভরের বস্তুর ওপরে ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বলের মান ও অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সমান। SI পদ্ধতিতে g এর গড় মান $9{\cdot}8\ ms^{-2}$,

$g = \frac{GM}{R^2}$ সমীকরণে যেহেতু G ও M ধ্রুবক, তাই g -এর মান R অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ওপর নির্ভরশীল।

যেহেতু পৃথিবীর সব স্থানে R-এর মান সমান নয় তাই পৃথিবীর সব স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের (g) মানও সমান নয়। তাই বস্তুর ওজন (= m × g) বিভিন্ন স্থানে খুব সামান্য হলেও ভিন্ন হয়।

- 1 kg ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে আকর্ষণ করে তার মান = 9×8 N। আবার চাঁদের গড় অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর গড় অভিকর্ষজ ত্বরণের $\frac{1}{6}$ গুণ।

  তাই কোনো বস্তুর ভর পৃথিবীতে 3 kg হলে, পৃথিবীতে তার ওজন = (3 ×9·8 N) তবে চাঁদে বস্তুটির ওজন হবে $\left(3 \times \frac{9{\cdot}8}{6} N\right)$

- পৃথিবীর টানে কোনো বস্তু পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকলে তাকে পতনশীল বস্তু বলে।

  স্থির অবস্থা থেকে বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে ইতালিয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

(i) একই উচ্চতা ও স্থির অবস্থা থেকে অবাধে পতনশীল সব বস্তুই সমান দ্রুততায় নীচে নামে।

(ii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর বেগও বাড়তে থাকে।

(iii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বও বাড়ে এবং সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

ইতালি পিসা শহরে বিখ্যাত হেলানো মিনারের শীর্ষ থেকে একটি লোহার গোলক ও একটি কাঠের গোলক ব্যবহার করে বায়ু মাধ্যমে তাদের অবাধে নীচে পড়তে দিয়ে তিনি সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করেন।

- পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে একটি পাথরের টুকরোকে জোরে উল্লম্বভাবে উপর দিকে ছুড়ে দিলে পাথরটি যত ওপরে ওঠে সেটির গতি তত কমতে থাকে এবং কমতে কমতে সেই গতির দিক উলটো হয়ে পাথরটি আবার অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্য হাতে ফিরে আসে। এর কারণ হলো বস্তুটির প্রাথমিক ত্বরণ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ বিপরীতমুখী। এর ফলে উর্ধ্বমুখী বেগ কমে যায় ও একটা সময় পর অভিকর্ষের টানের দিকে সরতে থাকে এবং পাথরটি ফিরে আসে।

কিন্তু যদি ভূমির সঙ্গে কোনাকুনিভাবে একটি পাথরের টুকরো ছোড়া হয়, সেক্ষেত্রেও অভিকর্ষের টান ভূমির দিকে, তাই অভিকর্ষের টানে এ জাতীয় চলন্ত বস্তুর বেগ পাল্টায় ও বস্তুটি ছবির মতন বাঁকা পথে ভূমিতে ফিরে আসে।

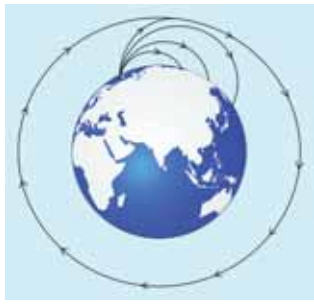

এক্ষেত্রে জোরে ছুটতে ছুটতে এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন পাথরটি পৃথিবীতে ফিরে আসার বদলে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে। পৃথিবী থেকে আকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহকে এভাবেই ছোড়ার ফলে তা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

স্থির তড়িৎবল ও আধানের ধারণা

ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে সৃষ্টি হওয়া তড়িৎকে বলে ঘর্ষণজাত তড়িৎ বা আধান (charge)।

ঘর্ষণের ফলে বস্তুতে তৈরি হওয়া এই অবস্থাকে বলে তড়িদাহিত অবস্থা।

- দুটি ফোলানো বেলুন একটি মোটা পশমের টুকরোয় ভালো করে ঘষে সুতো দিয়ে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দিলে দেখা যাবে যে বেলুনদুটো পরস্পর থেকে দরে সরে গেল। এর মানে হলো বেলুনদুটো পরস্পরকে **বিকর্ষণ** করল। কিন্তু বেলুনদুটিকে পশমের টুকরোয় ভালোভাবে ঘষে ছেড়ে দিলেও তারা পশমের টুকরোটার গায়ে আটকে থাকে। অর্থাৎ ঘর্ষণের পর পশমের টুকরো আর বেলুনের মধ্যে **আকর্ষণ বল** সৃষ্টি হয়।

এ থেকে বোঝা গেল, দুটি বেলুনেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের মধে সৃষ্টি হওয়া তড়িৎ আধান নিশ্চয় একই প্রকৃতির এবং পশমের টুকরোটিতে তৈরি হওয়া তড়িৎ আধান অন্য প্রকৃতির। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল

(i) একই জাতের তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে,

(ii) ভিন্ন জাতের আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এই দুই ভিন্ন জাতীয় তড়িৎ আধানের নামকরণ করা হয় ধনাত্মক তড়িৎ ও ঋণাত্মক তড়িৎ। এদের যথাক্রমে বীজগণিতের '+' ও '–' চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম তড়িতের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন।

- কোনো একটি বস্তুকে অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ঘষা হলে, কোন বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) ও কোন বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক (–) বলা হবে তা বার করা হয় নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে। এই তালিকাকে বলা হয় ট্রিবোইলেকট্রিক সিরিজ। তালিকায় অবস্থিত যেকোনো দুটি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে সেই বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) বলা হবে, যার নাম তালিকায় উপরে আছে; আর যার নাম তালিকায় নীচে আছে, সেই বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক বলা হবে। যেমন কাচকে অ্যামবার দিয়ে ঘষলে কাচ হবে ধনাত্মক (+) এবং অ্যামবার হবে ঋণাত্মক (–)।

1) পশম বা উল
2) কাচ
3) কাগজ
4) রেশম বা সিল্ক
5) কাঠ
6) মানুষের দেহ
7) ধাতব পদার্থ
8) এবোনাইট
9) গালা
10) অ্যামবার
11) রজন
12) সেলুলয়েড

কুলম্ব-এর সূত্র

তড়িৎ আধানযুক্ত দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কতটা জোরালো হবে তা হিসাব করার জন্য ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস অগস্টিন দ্য কুলম্ব একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সূত্রটি হলো $F = K\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$

এখানে q_1 এবং q_2 হলো তড়িদাহিত বস্তুদুটির আধানের পরিমাণ, r হলো তড়িদাহিত বস্তুটির মধ্যের দূরত্ব, F হলো বস্তুদুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বল (আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ)-এর মান। K-র মান তড়িদাহিত বস্তু দুটির মধ্যের অঞ্চলে কী পদার্থ আছে তার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, বায়ু এবং জলে K-র মান ভিন্ন হবে।

তড়িৎ আধানের পরিমাপ :

একই পরিমাণ সমআধানযুক্ত দুটি বিন্দু আকৃতির বস্তুকে শূন্যস্থানে পরস্পর থেকে 1 সেমি দূরত্বে রাখা হয় তবে বস্তুদুটির মধ্যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে এবং যদি এই বলের মান 1 ডাইন হয়, তাহলে বস্তুদুটির প্রতিটির আধানের পরিমাণ 1 ই.এস.ইউ (esu) বা 1 স্ট্যাট কুলম্ব।

এটিই হলো আধান মাপার একক। বিজ্ঞানী গাউস এই পরিমাপ পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা। এক্ষেত্রে শূন্যস্থানে K-র মান 1 ধরা হয়।

SI পদ্ধতিতেও আধান পরিমাপ করা যায়। সেক্ষেত্রে বলের একক 1 নিউটন, দূরত্ব 1 মিটার এবং আধান মাপার একক 1 কুলম্ব। এক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমে K-র মান 1 ধরা হয় না, K-এর মান হয় 9×10^9 $\frac{\text{নিউটন} \times (\text{মিটার})^2}{\text{কুলম্ব}^2}$

মনে রাখতে হবে, একই মাধ্যমে অবস্থিত দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে দূরত্ব বাড়লে আধান দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান কমে।

আমাদের চারপাশের সব বস্তুগুলো সাধারণভাবে আধানহীন বা নিস্তড়িৎ হয়, কারণ সমস্ত বস্তু পরমাণু দিয়ে তৈরি এবং পরমাণুগুলির যেহেতু নিস্তড়িৎ তাই বস্তুগুলোও নিস্তড়িৎ। কিন্তু এই নিস্তড়িৎ বস্তুগুলি ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ আধান পায় কীভাবে তা আমরা এখানে জানবো।

পরমাণুর কেন্দ্রে একত্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রনগুলি, এই কেন্দ্রটির নাম নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রনগুলি এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে পাক খায়। পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষপথে ইলেকট্রন যোগ করা বা সেখান থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু কেন্দ্র থেকে প্রোটন বা নিউট্রন সরানো সম্ভব নয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আয়নীয় যৌগ গঠিত হবার সময় পরমাণুগুলো এরকম ইলেকট্রন আদানপ্রদান করে। ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে **অ্যানায়ন**। ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে **ক্যাটায়ন**। পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে তা ঋণাত্মক আধানে আহিত হয় আর ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে ধনাত্মক আধানে আহিত হয়।

দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তু পরস্পর ঘষলে এইভাবেই ইলেকট্রনের আদানপ্রদান ঘটে এবং একটি বস্তু ধনাত্মক ও অপর বস্তুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়।

আবার, কোনো তড়িদাহিত বস্তুর উপস্থিতির কারণে একটি নিস্তড়িৎ বস্তুর দুই প্রান্তে বিপরীত তড়িতের সমাবেশ ঘটাকে বলা হয় তড়িৎ আবেশ।

তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

বিপরীতধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও সমধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই প্রকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটিই হলো বল (Force)। এই বলকে বলা হয় তড়িৎ বল বা স্থির তড়িৎ বল (Electrostatic force)। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা নিউক্লিয়াস ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত আর ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা। তাই নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে এবং চলন্ত ইলেকট্রনের বেগের অভিমুখ ক্রমাগত কেন্দ্রের দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে

ঘিরে পাক খেতে পারে। ছবিতে দেখো ইলেকট্রনের বেগ যে তির চিহ্ন (→) দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই তিরগুলো বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর তড়িৎ আকর্ষণ বল টানছে (→) বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

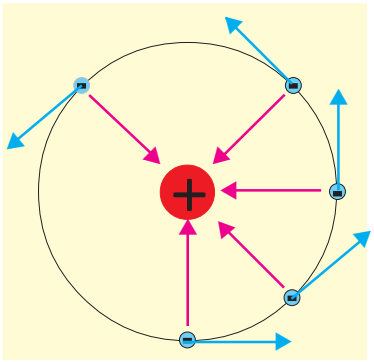

মনে রাখা জরুরি :

- সর্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না।
- পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা দুটি বস্তুকণাকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে টানে, তার তুলনায় ওই বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল পারস্পরিক আকর্ষণ বল এতটাই নগণ্য যে তার কোনো প্রভাব বাস্তবে বোঝা যায় না।
- দুটি আহিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল স্থির তড়িৎ বলের মান বস্তু দুটির মধ্যে মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।
- ঘর্ষণে স্থির তড়িৎ তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু তা সবসময়ই দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তুর ঘর্ষণে।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে অষ্টম শ্রেণির 'স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব পূর্বের তিনগুণ করা হলে, মহাকর্ষ বলের মান পূর্বের যতগুণ হবে তা হলো —

(ক) 3 (খ) $\frac{1}{3}$ (গ) 9 (ঘ) $\frac{1}{9}$

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ পৃথিবীতে গড় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান SI এককে _____।

২.২ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে _____ পথে আবর্তন করে।

২.৩ আয়নীয় যৌগ গঠিত হচ্ছে এমন অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় _____ বিনিময় ঘটে।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ বায়ুশূন্য স্থানে অভিকর্ষের টানে একটি পালক ও একটি কয়েন একই সময়ে নীচে পড়বে।

৩.২ সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর বেগ হ্রাস পায়।

৪. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

পৃথিবীর সর্বত্র 'g'-এর মান সমান নয়। এর একটা কারণ লেখো।

3 পদার্থের প্রকৃতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- কিছু ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সাপেক্ষে ধাতু ও অধাতুদের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
- ধাতুদের সক্রিয়তা শ্রেণির (activity series of metals) প্রাথমিক ধারণা গঠনে হাতেকলমে পরীক্ষা সম্পাদন করতে ও তার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবে।

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ গলে তরল হয়, তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হয়। তাপ প্রয়োগে কখনও কখনও কঠিন পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে বাষ্প অবস্থায় চলে যেতে পারে। এই ঘটনাকে বলে ঊর্ধ্বপাতন। সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছিলে যে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় গৃহীত বা বর্জিত তাপকে বলা হয় ঐ অবস্থান্তরের লীনতাপ। এই লীনতাপ গ্রহণ বা বর্জনের সময় পদার্থের উষ্ণতা পরিবর্তিত হয় না।

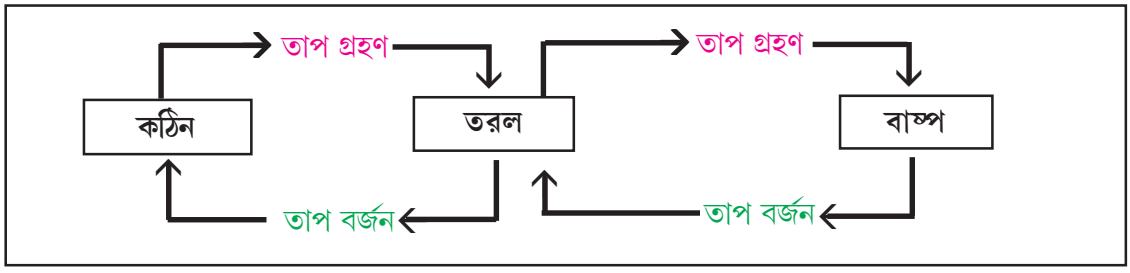

এবার নীচের সারণি পূরণ করো :

পদার্থ কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় বদলাচ্ছে	অবস্থার পরিবর্তনের নাম	লীন তাপ গ্রহণ/বর্জন	লীনতাপের নাম
কঠিন থেকে তরল	গলন		গলনের লীন তাপ
তরল থেকে কঠিন	কঠিনীভবন	বর্জন	
তরল থেকে বাষ্প	বাষ্পীভবন	গ্রহণ	
বাষ্প থেকে তরল	ঘনীভবন		

তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ও কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ণয় :

একটা বিকারে প্রায় 10 g বরফ নেওয়া হলো। পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো করে একটা পরীক্ষাগারের জন্য ব্যবহৃত থার্মোমিটার বরফের মধ্যে ডোবানো হলো। লক্ষ রাখা হলো থার্মোমিটারের পারদ কুণ্ড যেন বরফের মধ্যে ডোবানো থাকে। এবার নীচের ধাপগুলো সম্পন্ন করা হলো :

- বিকারটাকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হতে থাকলো।
- যখন বরফ গলতে শুরু করল তখন তাপের উৎস সরিয়ে নেওয়া হলো এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে লিখে রাখা হলো।

- একটি কাচদণ্ড বিকারের মধ্যে রাখা হলো। এবার বিকারের জলকে গরম করা হলো ও কাচদণ্ড দিয়ে জলকে নাড়া হলো, যতক্ষণ না বিকারের জল ফুটতে শুরু করে। যখন সমস্ত জল ফুটতে শুরু করবে তখন থার্মোমিটারকে নীচের ছবির মতো করে ফুটন্ত জলের বাষ্পের সংস্পর্শে রাখতে হবে।
- তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হবার সময় যা যা ঘটনা ঘটল তা লিখে রাখা হলো।

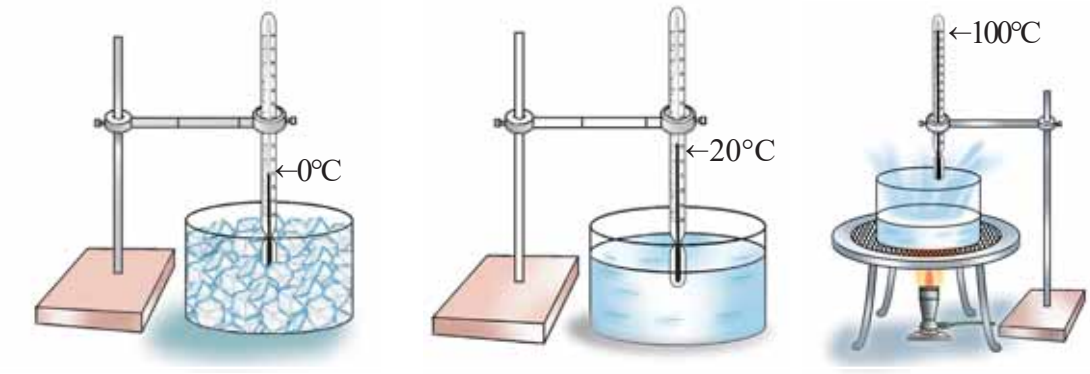

স্থির চাপে এক এক ধরনের কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে গলনের উয়্নতা এক এক রকমের হয়। এই নির্দিষ্ট উয়্নতা ওই কঠিন পদার্থগুলির গলনাঙ্ক। গলনাঙ্ক যেহেতু চাপ বাড়লে বা কমলে বদলে যায়, তাই কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ধারণ করার সময় চাপ কত ছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক 76 সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান চাপে নির্ধারণ করা হয় তবে তা হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পদার্থটির গলনাঙ্ক। একে পদার্থটির স্বাভাবিক গলনাঙ্ক বলে।

একটি নির্দিষ্ট উয়্নতায় তরলের সমগ্র অংশ থেকে অতি দ্রুত বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়াকে **স্ফুটন** বলা হয়। যে নির্দিষ্ট উয়্নতায় কোনো বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটন শুরু হয় ও যতক্ষণ স্ফুটন চলে ততক্ষণ ওই উয়্নতা স্থির থাকে, সেই উয়্নতাকে ওই তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** বলা হয়। ßþ³þÝþ~yA„þ যেহেতু চাপ বাড়লে বা কমলে বদলে যায়, তাই কোনো পদার্থের ßþ³þÝþ~yA„þ নির্ধারণ করার সময় চাপ কত ছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি কোনো পদার্থের ßþ³þÝþ~yA„þ 76 সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান চাপে নির্ধারণ করা হয় তবে তা হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পদার্থটির ßþ³þÝþ~yA„þ। একে পদার্থটির স্বাভাবিক ßþ³þÝþ~yA„þ বলে।

নীচের সারণিতে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কিছু বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হলো।

বিশুদ্ধ কঠিনের নাম	গলনাঙ্ক (°C)	বিশুদ্ধ তরলের নাম	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
জিঙ্ক	420	জল	100
সোনা	1063	ক্লোরোফর্ম	61
খাদ্যলবণ	801	বেঞ্জিন	80.1
লোহা	1530	ইথাইল অ্যালকোহল	78.3
রুপো	962	পারদ	357
অ্যালুমিনিয়াম	659	অ্যাসিটোন	56

হাতেকলমে

সবসময়ে কঠিনকে তাপ দিলে তরল পাওয়া যায় কি? এসো একটা পরীক্ষা করে দেখি।

- পাশের ছবির মতো কিছুটা কর্পূরের গুঁড়ো চিনামাটির তৈরি প্লেটে নাও।
- প্লেটের উপর রাখা কর্পূরের গুঁড়োকে ছবির মতো করে একটা ফানেল দিয়ে ঢাকা দাও। ফানেলের মুখটা তুলো দিয়ে

বন্ধ করো। তারপর ফানেলের গায়ে একটা জলে ভেজানো ফিল্টার কাগজ জড়িয়ে দাও।

- এবার চিনামাটির তৈরি প্লেটকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করো।
- কী ঘটতে দেখছ তা খাতায় লিখে রাখো।
- ওই একই পরীক্ষা পৃথকভাবে কর্পূরের বদলে ন্যাপথালিন, আয়োডিন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (নিশাদল) নিয়ে করলে দেখবে প্রতি ক্ষেত্রেই উপরে বর্ণিত ঘটনা ঘটছে। একে বলে **উর্ধ্বপাতন**। এই পদার্থগুলোর সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে দুটো অবস্থাই দেখা যায়, কঠিন অবস্থা ও গ্যাসীয় অবস্থা।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের সারণিটি পূরণ করো :

পদার্থের ভৌত অবস্থা	নির্দিষ্ট আকার আছে/ নেই	নির্দিষ্ট আয়তন আছে/ নেই	প্রবাহিত হতে পারে / পারে না	স্থির উষ্ণতায় চাপ প্রয়োগ করলে আয়তনের পরিবর্তন হয় / কম হয়/প্রায় হয় না	স্থির চাপে তাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটে	স্থির চাপে তাপ নিষ্কাশন করলে কী ঘটে
কঠিন						
তরল						
গ্যাসীয়						

পদার্থের ধর্মগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (i) ভৌত ধর্ম (ii) রাসায়নিক ধর্ম

(i) ভৌত ধর্ম — পদার্থের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ যেমন ভৌত অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, চৌম্বক ধর্ম, দ্রাব্যতা প্রভৃতি ধর্মগুলোর সাহায্যে শুধু পদার্থের বাহ্যিক অবস্থার ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ অণুর গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না তা এই ধর্ম দিয়ে বোঝা যায় না। এই ধর্মগুলোকে ভৌত ধর্ম বলে।

(ii) রাসায়নিক ধর্ম — যে ধর্ম থেকে কোনো পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতা বোঝা যায় তাকেই ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়। এটা জলের রাসায়নিক ধর্ম। আবার সালফারকে বাতাসে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা সালফারের রাসায়নিক ধর্ম। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে জিঙ্ক ধাতুর টুকরো যোগ করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা জিঙ্কের একটা রাসায়নিক ধর্ম।

এখন আমরা তোমাদের বিভিন্ন রকমের কঠিন পদার্থের আরও কিছু ধর্মের কথা বলব। এই ধর্মগুলো হল তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা, তড়িৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা, নমনীয়তা আর প্রসারণশীলতা।

রান্নাঘরে মা হাঁড়িতে ভাত রান্না করেন, কড়ায় মাছ ভাজেন, বড়ো বাটিতে সবজি সিদ্ধ করেন, তাওয়ায় রুটি সেঁকেন।

এই পাত্রগুলো কী দিয়ে তৈরি— ধাতু, প্লাস্টিক না কাচ? তোমরা বলবে এগুলো হয় লোহা নয়তো অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। **অ্যালুমিনিয়াম আর লোহা হলো ধাতু; সোনা, পিতল, কাঁসা আর তামাও আরও চারটে ধাতুর উদাহরণ।** এদের প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে তাপ খুব সহজেই যেতে পারে। প্রত্যেকটাই বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। প্রত্যেকটাই চকচকে করে তোলা যায়। ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় বলেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কখনোই লোহার চেয়ার, টুল বা মইতে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিকের লাইনের কাজ করেন না। আবার রান্নার বাসনের মধ্যে দিয়ে তাপ ভালোভাবে যেতে না পারলে রান্না তাড়াতাড়ি করা যেত কি? সেই কাজেই তাই ধাতুই চাই। **কাচ, চিনেমাটি, প্লাস্টিক, কাঠ, রাবার এসব হলো অধাতু।** এদের কোনোটাই তাপ আর তড়িতের সুপরিবাহী নয়। দেখা যাচ্ছে আমাদের চেনা নানান ধরনের পদার্থের কিছু ধর্মের সাহায্যে তাদের দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, ধাতু আর অধাতু।

ধাতু আর অধাতুর ধর্মে কী কী পার্থক্য থাকে

ধাতু	অধাতু
1. ধাতুর মধ্যে দিয়ে তাপ ও তড়িৎ সহজেই যেতে পারে। তাই এদের বলা হয় তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।	1. সাধারণত অধাতুর মধ্যে দিয়ে তাপ আর তড়িৎ ভালো-ভাবে যেতে পারে না, অর্থাৎ তাপ ও তড়িতের কুপরিবাহী।
2. ধাতুকে টেনে লম্বা তারের আকৃতি দেওয়া যায়।	2. সাধারণত অধাতুরা ধাতুর মতো প্রসারণশীল নয়।
3. ধাতুকে পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়।	3. অধাতুকে আঘাত করলে সাধারণত তা ভেঙে যায়।
4. ধাতুকে আঘাত করলে 'ঠং' করে শব্দ হয়।	4. অধাতুকে আঘাত করলে এইরকম শব্দ শোনা যায় না।

ওপরে তোমাদের যেসব কথা বলা হলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে। যেমন ধরো হিরে অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী; গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপ এবং তড়িতের সুপরিবাহী। ধাতু হলেও সাধারণ উষ্ণতায় পারদ কঠিন নয়, তরল।

মনে রেখো, যে কোনো মৌল বা যৌগের চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু বহু লক্ষ কোটি পরমাণু/অণু থাকে। অণু বা পরমাণুর নিজস্ব কোনো রং নেই। আর একটা কথা খুব দরকারি—**ধাতুর যেসব ধর্মের কথা তোমরা পড়লে** (তাপ পরিবাহিতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, প্রসারণশীলতা, নমনীয়তা, রং) **সেসবের কোনোটাই কিন্তু ধাতুর পরমাণুর ধর্ম নয়।** তাহলে এসব ধর্ম কার ধর্ম? — যেকোনো ধাতুর মধ্যে বহু বহু লক্ষ কোটি পরমাণু থাকে। ওই অত সংখ্যক পরমাণু এক সঙ্গে জোট বেঁধে থেকে যে নমুনা তৈরি করে সেটাকে নিয়েই তুমি ধাতুর নানান ধর্মের পরীক্ষা করতে পারো। **তাহলে ওইসব ধর্ম হল সেই সমষ্টি বা জোটের ধর্ম। একক পরমাণুর রং, তাপ পরিবাহিতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, প্রসারণশীলতার কোনো অর্থ নেই।** তোমরা জানো যে সোনাকে পিটিয়ে খুব পাতলা পাত করা যায়, তাই আমরা যদি বলি 'সোনা খুব প্রসারণশীল ধাতু' তাহলে কথাটা ঠিক হবে। তা বলে যদি কেউ বলে 'সোনার পরমাণু প্রসারণশীল' তাহলে কিন্তু মোটেই ঠিক কথা বলা হবে না। আবার 'সোনার চেয়ে লোহা অনেক শক্ত ধাতু', কথাটায় ভুল নেই। কিন্তু তা বলে 'সোনার পরমাণুর চেয়ে লোহার পরমাণু শক্ত' এমন ভাবলে তা একেবারেই ভুল হবে। আবার কোনো কঠিনের চোখে দেখার মতো নমুনার ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক কথাটা ঠিক, কোনো তরলের চোখে দেখার মতো নমুনার ক্ষেত্রে স্ফুটনাঙ্ক কথাটা ঠিক। কিন্তু **পদার্থের একটা অণু বা পরমাণুর ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক অর্থহীন কথা।** তাই জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C বললে তা ঠিক হবে, কিন্তু জল অণুর স্ফুটনাঙ্ক 100°C ভাবলে তা ভুল হবে।

ধাতু ও অধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতার পরীক্ষা:

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- একটা ব্যাটারি
- হোল্ডার সমেত একটা বালব
- তিন টুকরো তামার তার
- দুটো ধাতুর তৈরি ক্লিপ
- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, কাঠকয়লা, গ্রাফাইট, সালফার (গন্ধক) প্রভৃতির টুকরো

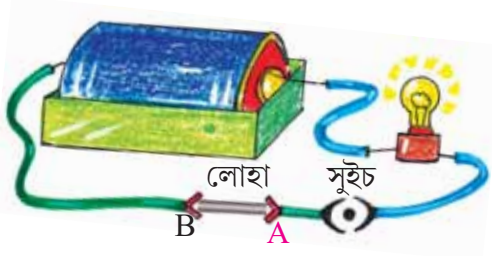

কী করা হলো	কী দেখা গেলো	কারা বিদ্যুতের সুপরিবাহী ও কারা কুপরিবাহী
ছবির মতো করে ব্যাটারি, বালব ও তার আটকানো হলো। তারের দুই প্রান্তে A ও B দুটি ধাতুর তৈরি ক্লিপ যোগ করা হলো। এবার বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর টুকরোগুলোর একটি প্রান্তে A ও অন্য প্রান্তে B দিয়ে সংযোগ করা হলো। প্রতিক্ষেত্রে বালব জ্বলল কি জ্বলল না তা লক্ষ করা হলো।	লোহা, জিঙ্ক, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, গ্রাফাইট থাকলে আলো জ্বলছে। সালফার বা কাঠকয়লা থাকলে আলো জ্বলছে না।	সাধারণভাবে ধাতুগুলো তড়িতের সুপরিবাহী এবং অধাতুগুলো তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট অধাতু হলেও তড়িতের সুপরিবাহী।

তুমি নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক তার দিয়ে লাইট জ্বালাতে দেখেছ। ঐ তারগুলোর ওপর একটা PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) কিংবা রাবারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। ধাতব তারের ওপর এই ধরনের আস্তরণ দেওয়া থাকে কারণ সেই তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাবার সময় তা ছুঁয়ে ফেললে শক লাগবে না।

ধাতু ও অধাতুদের ভৌত ধর্মের সম্বন্ধে নীচের উদাহরণগুলো দেখো।

- সাধারণ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ধাতু উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ হলেও পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল ধাতু। গ্যালিয়াম (Ga) ও সিজিয়াম (Cs) ধাতু হলেও এদের গলনাঙ্ক যথাক্রমে 29.78°C এবং 28.4°C।
- লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ধাতু হলেও অন্য ধাতুদের মতো কঠিন নয় অপেক্ষাকৃত নরম। এদের সামান্য ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা যায়।
- অধাতুরা সাধারণত অনুজ্জ্বল হয়, কিন্তু কেলাসিত আয়োডিনের উজ্জ্বলতা আছে।
- কার্বন অধাতু। কার্বন বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে। এদের কার্বনের রূপভেদ বলে। কার্বনের দুটি রূপভেদ হলো হিরে ও গ্রাফাইট। হিরে উজ্জ্বল এবং প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। হিরে তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল অধাতু হলেও তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।

ভেবে দেখো

- এমন কোনো ধাতুর কথা বলতে পারো কি যাকে বোতল, কাপ আর প্লেটে রাখলে এক একবার এক একরকম আকৃতির দেখাবে?
- ওপরে তোমরা যেসব ধাতুর কথা জানলে তার মধ্যে এমন কোন ধাতু আছে যা মে এবং ডিসেম্বর মাসে একই ভৌত অবস্থায় নাও থাকতে পারে?
- পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের খুব পাতলা ধাতব পাতের প্রয়োজন হয়েছিল। তোমার কী মনে হয় নিচের কোন ধাতু তিনি সেই উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন— দস্তা / লোহা / সোনা?
- ধরো হিরে গ্রাফাইটের চেয়েও সস্তা হয়ে গেছে। তাহলে কি তুমি ব্যাটারির তড়িদ্দ্বার তৈরি করতে গ্রাফাইটের বদলে হিরে ব্যবহার করবে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।
- ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বললে খুব গরম হয়ে যায়। বাল্বের মধ্যের সরু তার (ফিলামেন্ট) তৈরি হয় টাংস্টেন ধাতু দিয়ে। এই কাজে টাংস্টেনের কোন কোন ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয়?

ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে ধাতু ও অধাতুদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে হলে তাদের ভৌত ধর্মই যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক ধর্মও জানা প্রয়োজন।

নীচের সারণির দুদিকের কথাগুলো ঠিকঠাক মেলাও :

ভৌত ধর্ম	ধাতু/অধাতু
1. ঘরের উষ্ণতায় তরল ধাতু	ক) সোনা
2. প্রসার্যতা খুব বেশি	খ) হিরে
3. অধাতু হলেও তাপ পরিবাহিতা খুব বেশি, তড়িৎ পরিবাহিতা নগণ্য	গ) গ্রাফাইট
4. অধাতু হলেও তাপ ও তড়িৎ পরিবাহিতা খুব বেশি	ঘ) পারদ

নীচের সারণিতে কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হলো। ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করে লেখো :

ঘটনা	ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন
1. জলে তড়িৎ পাঠালে জল থেকে H_2 ও O_2 গ্যাস পাওয়া যায়	
2. উত্তপ্ত করলে কর্পূর ঊর্ধ্বপাতিত হয়	
3. খোলা হাওয়া ও জলের সংস্পর্শে লোহায় মরচে ধরে	
4. লঘু H_2SO_4 দ্রবণে Zn ধাতু যোগ করলে H_2 গ্যাস পাওয়া যায়	
5. লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়	

রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পদার্থের শনাক্তকরণ

নির্দিষ্টভাবে কোনো পদার্থকে শনাক্ত করতে হলে অনেক সময়েই সেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষা করা দরকার। কোনো পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয় করার জন্য তাকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে কী হয় তা দেখা হয়। আবার জল, অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য নানান পদার্থের সংযোগে পরীক্ষণীয় পদার্থের কী পরিবর্তন হয় এবং কী কী নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস বর্ণহীন কিন্তু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) বাদামি বর্ণের।

একটি গ্যাসজারে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস আছে। গ্যাসজারের মুখ খুললে দেখা যায় বাদামি বর্ণের গ্যাস নির্গত হচ্ছে।

বিক্রিয়ার সমীকরণ : $2NO + O_2 = 2NO_2$ । এর সাহায্যে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস শনাক্ত করা যেতে পারে।

তোমাকে কিছুটা চিনির গুঁড়ো ও কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো দেওয়া হলো। জলের সঙ্গে মিশিয়ে কীভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য করবে?

দুটো গ্লাসে জল নিয়ে একটার মধ্যে খানিকটা চিনির গুঁড়ো আর অন্যটার মধ্যে কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো মেশাও। গ্লাস দুটোকে হাত দিয়ে চেপে ধরো ও তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো। **সতর্কতা :** পোড়াচুনের গুঁড়ো চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক তাই সাবধানে থাকতে হবে। চুনজল যেন কোনোভাবেই চোখে না পড়ে।

জলে কী মেশানো হলো	কী দেখা গেলো? কেন এমন হলো?
চিনির গুঁড়ো	চিনি জলে দ্রবীভূত হলো
পোড়াচুনের গুঁড়ো	পোড়াচুন ও জলের বিক্রিয়ায় উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হলো এবং কলিচুন তৈরি হলো

জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যদি কোনো পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন আনে তবে সেই পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে সহজে চেনা যায়। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম-এর মতো ধাতু জলের সংস্পর্শে এলেই তীব্র বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে আগুন জ্বলে ওঠে।

- তোমাকে দুটো পাত্রে (A ও B) একটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গুঁড়ো অন্যটাতে চিনির গুঁড়ো দেওয়া হলো। তুমি স্বাদ না নিয়ে কোনটা নুন এবং কোনটা চিনি কীভাবে চিনবে? এসো একটা পরীক্ষা করা যাক।

হাতেকলমে

প্লাস্টিকের হাতল লাগানো দুটো স্টিলের চামচের একটায় কিছুটা চিনির গুঁড়ো, আর অন্যটায় কিছুটা সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে মোমবাতির সাহায্যে ভালো করে গরম করো। তুমি যা দেখতে পাবে তা থেকে কীভাবে পদার্থ দুটোকে চেনা যাবে নীচের সারণিতে তা বলা হলো।

কোন পদার্থকে গরম করলে	কী ঘটতে দেখবে	কেন এমন হলো
চিনির গুঁড়ো	প্রথমে বাদামি হয়ে যাবে তারপর আরো গরম করলে কালো হয়ে যাবে	তাপ প্রয়োগে চিনির নানা ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটল।
সোডিয়াম ক্লোরাইড	চোখে দেখা যাবে এমন কোনো পরিবর্তন হবে না।	শুধু গরম হবে, সামান্য জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো পরিবর্তন হবে না।

এবার তোমরা তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে নীচের পদার্থগুলোকে সাবধানে টেস্টটিউবে গরম করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণ নীচের সারণির সঙ্গে মেলাও।

যা তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হলো	কী পরিবর্তন হলো
1) জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেট কেলাস	নীল কেলাস ভেঙে কালো গুঁড়ো হয়, বাদামি গ্যাস বের হয়।
2) কঠিন আয়োডিন	উর্ধ্বপাতন ঘটে।
3) ম্যাগনেশিয়াম তার	তীব্র আলোর সৃষ্টি করে। প্রধানত সাদা রঙের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) উৎপন্ন হয়।

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন পদার্থের উপর তাপের প্রভাব আছে। অনেক পদার্থ আছে যাদের ওপর তাপ প্রয়োগ করলে বিক্রিয়া ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপ প্রয়োগ দ্বারা আমরা বেশ কিছু পদার্থকে শনাক্ত করতে পারি।

- আলাদা আলাদা পদার্থসহ তিনটে টেস্টটিউব A, B, ও C তোমাকে দেওয়া হলো। টেস্টটিউবগুলোয় জিঙ্কের গুঁড়ো, লোহার গুঁড়ো এবং ফেরাস সালফাইডের টুকরো আছে। তুমি কীভাবে কোন টেস্টটিউবে কী আছে তা শনাক্ত করবে?

হাতেকলমে

তিনটে টেস্টটিউবের মধ্যেই তুমি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করো। তোমার পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে দেওয়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলছে কিনা দেখো এবং সেখান থেকে পদার্থগুলোকে শনাক্ত করো।

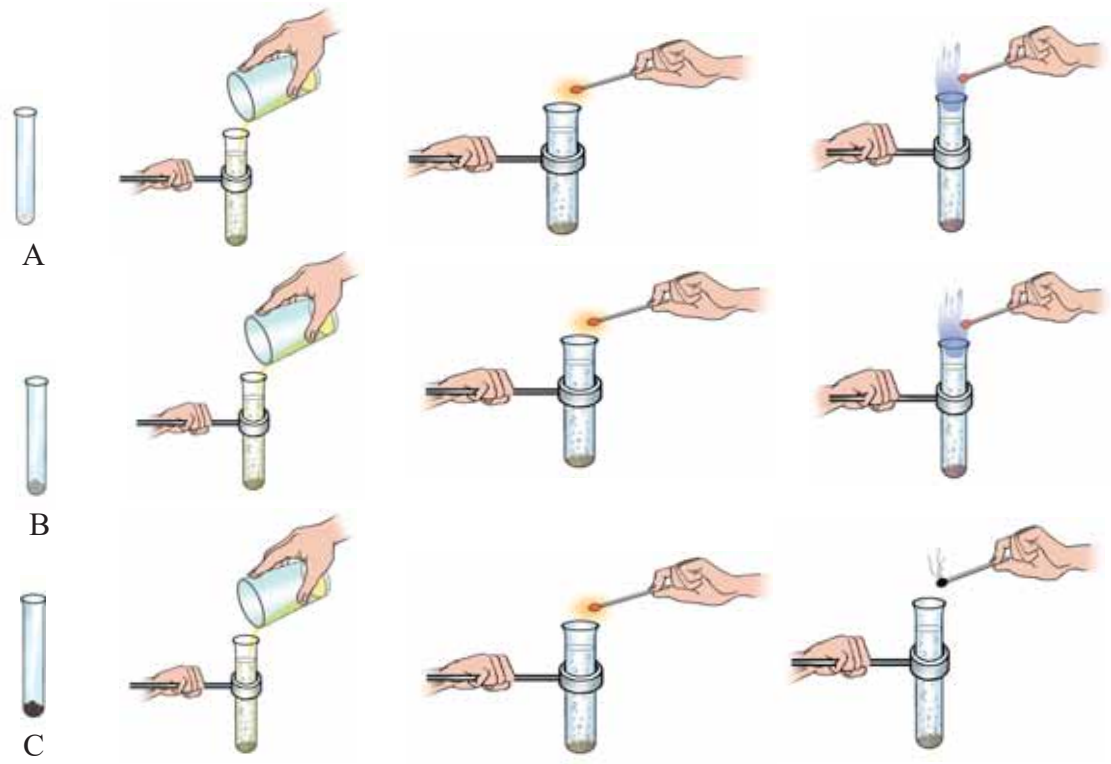

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ ও সমীকরণ
টেস্টটিউবে জিঙ্কের (Zn) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে বর্ণহীন, গন্ধহীন হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। নির্গত গ্যাসে জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে গ্যাস শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে লোহার (Fe) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে যে বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয় তা আগুনের স্পর্শে শব্দসহ নীলাভ শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। উৎপন্ন দ্রবণের বর্ণ খুব ফিকে সবুজ হয়। $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে ফেরাস সালফাইডের (FeS) সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ সৃষ্টি করে পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস বের হয়। $FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$

তাহলে তোমরা দেখলে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া ভিন্ন হয়। সুতরাং অ্যাসিড যোগ করে বিভিন্ন পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। অ্যাসিড যোগ করে আর কোন কোন পদার্থকে শনাক্ত করা যায় তা জানার চেষ্টা করো।

অ্যাসিড দিয়ে যেমন কোনো পদার্থকে চেনা যায়, ক্ষারকীয় পদার্থ দিয়ে কোনো জিনিসকে কীভাবে শনাক্ত করা যায়?

হাতেকলমে

একটা খলের (Mortar) মধ্যে কিছুটা নুন নাও। তার সঙ্গে কিছুটা খাবার সোডা মেশাও। এবার নুড়ির (Pestle) সাহায্যে ভালো করে মিশ্রণটাকে ঘষে গন্ধ নাও। একইভাবে কিছুটা নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে তার মধ্যে খাবার সোডা মিশিয়ে ঘষে সাবধানে তার গন্ধ নাও। খেয়াল রেখো কোনো গুঁড়ো যেন নাকে বা চোখে ঢুকে না যায়। তোমার অনুভূতি নীচে লেখো। পরীক্ষার পর ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

খাবার সোডার সঙ্গে কোন পদার্থ মেশানো হলো	পরীক্ষায় কী বোঝা যাবে?
নুন	কোনো গন্ধ বেরোয় না
নিশাদল	অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোয়

টেস্টটিউবে নমুনা নিয়ে তার মধ্যে কলিচুন বা কস্টিক সোডা মিশিয়ে সাবধানে গরম করলে এই পরীক্ষায় আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে উত্তপ্ত করার পরীক্ষাটি শিক্ষক/শিক্ষিকা করে দেখাবেন।

জলের সঙ্গে ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়া

নীচের পরীক্ষা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য ছাড়া করা যাবে না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

(i) লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, কার্বন, সালফার, (ii) পাতিত-জল, (iii) গ্লাস উল, (iv)একটা শক্ত কাচের টেস্টটিউব (A), (v) একটা রবারের ছিপি, (vi) একটা কাচের নির্গম নল, (vii) একটা সাধারণ টেস্টটিউব (B), (viii) একটা ক্ল্যাম্প, (ix) একটা স্পিরিট ল্যাম্প

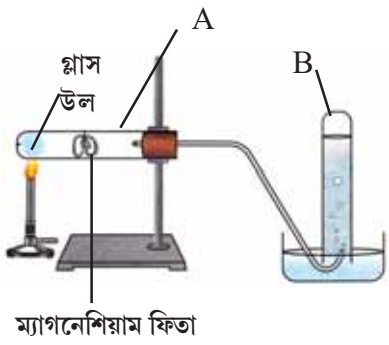

কী করলে	কী দেখলে	কী সিদ্ধান্ত নিলে
• ম্যাগনেশিয়ামের ফিতার টুকরো নিয়ে ছবির মতো করে পরীক্ষা করা হয়। জলে ভেজানো গ্লাসউলকে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপের ফলে গ্লাসউলে সঞ্চিত জল থেকে উৎপন্ন গরম জলীয় বাষ্প ম্যাগনেশিয়ামের সংস্পর্শে আসে। • গ্যাসটাকে নিয়ে আগুনে ধরা হলো।	• কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে B টেস্টটিউবে বুদবুদ আকারে গ্যাস বেরোচ্ছে যা জলকে সরিয়ে গ্যাসজারে জমা হচ্ছে। • গ্যাসটা আগুনের শিখার সংস্পর্শে এলেই নীলচে শিখায় খুব অল্প সময় শব্দসহ দপ করে একবার জ্বলেই নিভে যায়।	গ্যাসটা হলো হাইড্রোজেন যা জলের নিম্ন অপসারণ ঘটিয়ে গ্যাসজারে জমা হচ্ছে। ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার সমীকরণে শূন্যস্থান পূরণ করে সমতা বিধান করো। $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 +$ ____

জলের সঙ্গে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, সোনা, রুপো, তামা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অধাতু নিয়ে একইভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে —

- সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ওই তাপে ধাতুতে আগুনও লেগে যেতে পারে।
- ক্যালশিয়ামের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জলের বিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক কম এবং লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক — এরা ঠাণ্ডা বা গরম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু লোহা, জিঙ্ক স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।
- সিসা, তামা, সোনা এবং রুপো কোনো অবস্থাতেই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

পরের পাতায় জলের সঙ্গে ধাতুগুলোর বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হলো :

$Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

$3Fe + 4H_2O$ (স্টিম) $\longrightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

$Zn + H_2O$ (স্টিম) $\longrightarrow ZnO + H_2$

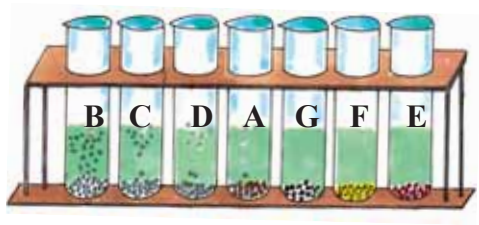

ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া

প্রয়োজনীয় দ্রব্য

- লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)।
- লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং সালফার প্রভৃতি অধাতুর টুকরো। পরীক্ষা করার আগে এই টুকরোগুলো শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিতে হবে।

কী করলে	কী দেখলে	এখানে কী ঘটছে?
7 টা টেস্টটিউব A, B, C, D, E, F, G নাও। প্রত্যেকটার অর্ধেক পর্যন্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাও। এবার A, B, C, D, E, F, G টেস্টটিউবে. যথাক্রমে Fe, Mg, Al, Zn, Cu, S এবং C-এর সম ওজনের খুব ছোটো টুকরো যোগ করো। কোন টেস্টটিউব থেকে গ্যাস নির্গত হলো এবং গ্যাস নির্গত হবার হার লক্ষ করো। গ্যাসটা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং আগুন দিলে একবার নীল শিখায় জ্বলেই শব্দ করে নিভে যায়।	A , B, C ও D টেস্টটিউব থেকে বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হলো। E, F এবং G থেকে কোনো গ্যাস নির্গত হলো না। B থেকে সবচেয়ে দ্রুত গ্যাস নির্গত হলো।	নির্গত গ্যাসটি হলো হাইড্রোজেন A টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ B টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ C টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + H_2$ D টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

তোমরা আগেই জেনেছ Zn ধাতুর সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক (বা সালফিউরিক) অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিঙ্কের লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বদলে নাইট্রিক অ্যাসিড নিলে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে না। এই পরীক্ষা Na বা K নিয়ে করা উচিত নয়। কারণ Na বা K-এর সঙ্গে জল বা অ্যাসিডের বিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

সব ধাতুর লঘু অ্যাসিড থেকে **হাইড্রোজেন গ্যাস** উৎপাদন করার প্রবণতা সমান নয়। লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করার এই প্রবণতার ক্রম নীচে দেওয়া হলো। তালিকার সবচেয়ে বাঁদিকে যে ধাতুটি আছে সেটির লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি ।

K Ca Na Mg Al Zn Fe Pb (H) Cu Hg Ag Au

প্রবণতা সবচেয়ে বেশি

লঘু অ্যাসিড থেকে H_2 তৈরিতে অক্ষম

লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের ক্রম থেকে জানা যায় যেসব ধাতু এই তালিকায় হাইড্রোজেনের বাঁদিকে আছে তারাই লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে। এদের বলা হয় তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু। আর তালিকায় হাইড্রোজেনের পরে যেসব ধাতু আছে তারা লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করতে পারে না। আবার

তালিকার বাঁদিকে থাকা কোনো মৌল ডানদিকের মৌলের যৌগ থেকে তাকে মৌল আকারে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। যেমন — কপার সালফেট দ্রবণে একটা লোহার পেরেক ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে লোহার পেরেকের গায়ে ধাতব কপারের লালচে বাদামি রঙের একটা আস্তরণ পড়েছে। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো :

$$\underset{\text{কঠিন}}{Fe} + \underset{\text{দ্রবণে}}{CuSO_4} \longrightarrow \underset{\text{দ্রবণে}}{FeSO_4} + \underset{\text{কঠিন}}{Cu}$$

- **নীচে বর্ণিত একটি ক্ষেত্রে বিক্রিয়া ঘটে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং একটি ক্ষেত্রে বিক্রিয়া ঘটে একটি ধাতুর অধঃক্ষেপ পড়বে। এই দুটি বিক্রিয়াকে শনাক্ত করো। তোমায় লঘু অ্যাসিড দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করার প্রবণতার ক্রমের কিছু অংশ দেওয়া হলো যার সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।**

উল্লিখিত ক্রম (আংশিক) : Mg Zn Fe (H) Cu Au

(H_2 মুক্ত করার প্রবণতা বেশি) (H_2 মুক্ত করার প্রবণতা নেই)

সম্ভাব্য বিক্রিয়ার তালিকা : ক) লঘু H_2SO_4 দ্রবণে ম্যাগনেসিয়ামের টুকরো যোগ করা হলো। খ) লঘু H_2SO_4 দ্রবণে কপারের টুকরো যোগ করা হলো। গ) কপার সালফেট দ্রবণে লোহার টুকরো যোগ করা হলো। ঘ) জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে লোহার টুকরো যোগ করা হলো।

মনে রাখা জরুরি :

- ধাতুর তাপ পরিবাহিতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, প্রসারণশীলতা, নমনীয়তা, রং কোনোটাই কিন্তু ধাতু বা অধাতুর পরমাণুর ধর্ম নয়। যেকোনো ধাতুর মধ্যে বহু লক্ষ কোটি পরমাণু থাকে। ওই অত সংখ্যক পরমাণু এক সঙ্গে জোট বেঁধে থেকে যে নমুনা তৈরি করে সেটাকে নিয়েই পদার্থের নানান ধর্মের পরীক্ষা করা হয়। তাহলে ওইসব ধর্ম হলো সেই বহু লক্ষ কোটি পরমাণুর সমষ্টি বা জোটের ধর্ম।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে অষ্টম শ্রেণির 'পদার্থের প্রকৃতি' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১ তাপের সুপরিবাহী ও তড়িতের কুপরিবাহী এমন একটি অধাতু হলো _____।

১.২ লঘু H_2SO_4 ও লোহার বিক্রিয়ায় _____ গ্যাস মুক্ত হয়।

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

২.১ জিঙ্ক ও লোহা উভয়েই লঘু H_2SO_4 দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করতে পারে।

2.2 !£öî "þyþ™ ç "þ!vþö"þî ¢þ™!îîy£#Ð

2.3 ö¢y˜yî öë •ö›î <˜Ä ö¢y˜yî ...î ¢î "þyî ÷"þ!î „þîy ëyë ö¢!Ýþ £öœy "þ!vþê þ™!îîy!£"þyÐ

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ লোহার সঙ্গে লঘু HCl দ্রবণের বিক্রিয়ার কী ঘটে সমীকরণ লেখো।

৩.২ কপার সালফেট দ্রবণে লোহার টুকরো যোগ করলে যা ঘটবে রাসায়নিক সমীকরণসহ লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ তরলের চাপ ক্রিয়া করে — (ক) শুধু নীচের দিকে (খ) শুধু পাশের দিকে (গ) শুধু উপরের দিকে (ঘ) সবদিকে সমানভাবে।

১.২ SI পদ্ধতিতে G-এর একক হলো — (ক) $\frac{Nm}{kg}$ (খ) $\frac{Nm^2}{kg}$ (গ) $\frac{Nm}{kg^2}$ (ঘ) $\frac{Nm^2}{kg^2}$ ।

১.৩ ঘনত্বের SI এককটি হলো --- (ক) গ্রাম/ঘনসেমি (খ) কিলোগ্রাম/ঘনসেমি (গ) গ্রাম/ঘনমিটার (ঘ) কিলোগ্রাম/ ঘনমিটার ।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ একটি অধাতু যা তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী তা হলো _____।

২.২ 1 kg ভরের বস্তুকে পৃথিবী _____ নিউটন বলে আকর্ষণ করে।

২.৩ চাপের সংজ্ঞায় বল ও _____ লব্ধ রাশি দুটি আছে।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ হিরে তাপের কুপরিবাহী পদার্থ।

৩.২ দুটি তরলের মধ্যে যার ঘনত্ব বেশি সেটিতে একটি বস্তু কম নিমজ্জিত হবে।

৩.৩ সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্বও বাড়ে।

৩.৪ বল নয়, চাপ দিয়েই কোনো তরলের প্রবাহের অভিমুখ ঠিক হয়।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ একটি ধাতুর নাম অথবা চিহ্ন লেখো যা লঘু H_2SO_4 দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করতে পারে না।

৪.২ যে বস্তুর ওজন পৃথিবীপৃষ্ঠে 60N চাঁদে তার আপাত ওজন কত হবে?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ ধরো হিরে গ্রাফাইটের চেয়েও সস্তা হয়ে গেছে। তাহলে কি তুমি ব্যাটারির তড়িদ্দ্বার তৈরি করতে গ্রাফাইটের বদলে হিরে ব্যবহার করবে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৫.২ প্লবতা বলতে কী বোঝায়?

৫.৩ 20 kg জল 0.5 বর্গমিটার ক্ষেত্রফলে কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারবে?

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ তড়িতাহিত চিরুনি নিস্তড়িৎ কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে কী করে?

৬.২ লঘু H_2SO_4 দিয়ে কীভাবে তুমি লোহার গুঁড়ো ও ফেরাস সালফাইডের পার্থক্য নির্ণয় করবে? সমীকরণসহ লেখো।

৬.৩ ইস্পাতের পেরেক জলে ডুবে যায় কিন্তু ইস্পাতের তৈরি জাহাজ তার চেয়ে বহুগুণ ভারী হলেও জলে ভাসে। কেন এমন হয় ব্যাখ্যা করো।

৬.৪ 14 kg ও 5 kg ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে 7 মিটার দূরত্বে আছে। এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের মান নির্ণয় করো। সহজ হিসেবের জন্য ধরে নাও G-এর মান $7 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$।

4 পদার্থের গঠন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ডিমোক্রিটাস থেকে ডাল্টন পর্যন্ত পরমাণুর ধারণা কীভাবে গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।
- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সাহায্যে গড়ে ওঠা পারমাণবিক গঠনের প্রাথমিক ধারণার বর্ণনা দিতে পারবে।
- প্রদত্ত রেখাচিত্র থেকে কিছু মৌলের পরমাণুর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে এবং সেই ধরনের তথ্য সাপেক্ষে আইসোটোপ ও আইসোবার চিহ্নিত করতে পারবে।
- পদার্থের তিনটি অবস্থার (কঠিন, তরল ও গ্যাস) বর্ণনায় কণার (অণু ও পরমাণুর) ধারণা প্রয়োগ করতে পারবে।
- সরল আয়নীয় যৌগদের রাসায়নিক নাম থেকে সংকেত গঠন করতে পারবে।

পরমাণু ও অণুর ধারণা

আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও তাঁর ছাত্র ডিমোক্রিটাস বললেন যে কোনো জিনিসকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এক সময় তাকে আর ভাঙা যাবে না। যে অতিক্ষুদ্র কণাকে আর ভাঙা যাবে না ডিমোক্রিটাস তার নাম দিলেন atomos (অ্যাটোমোস)। গ্রিক ভাষায় atomos মানে 'যাকে আর ভাঙা যায় না'। এখান থেকেই atom কথাটা এসেছে। বাংলায় আমরা অ্যাটমকে বলি পরমাণু। লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস কিন্তু পরমাণুদের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। আরো পরে গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস ও রোমান দার্শনিক লুক্রেশিয়াস ডিমোক্রিটাসের কথাগুলোই বললেন। কিন্তু পরীক্ষা করে পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে ইউরোপ প্রায় ভুলেই গেল লিউসিপ্পাস-ডিমোক্রিটাসের কথা। গ্রিক দার্শনিকরা ছাড়াও ভারতীয় দার্শনিক কণাদ-ও পরমাণুর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন।

1660 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ব্রিটেনে আইজ্যাক নিউটন ও রবার্ট বয়েল কল্পনা করলেন পদার্থ কিছু অতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। পরবর্তী প্রায় একশো বছরে ইউরোপে রসায়নবিদরা নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস-সহ বেশ কিছু মৌল আবিষ্কার করলেন। বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। বিক্রিয়াগুলোর ধরনে বেশ কিছু মিলও আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু কেন সেসব ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

1808 খ্রিস্টাব্দে জন ডালটন তাঁর পরমাণুবাদ (atomic theory) প্রকাশ করলেন। তিনি ধরে নিলেন (1) মৌলের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা হলো পরমাণু (atom) যা সৃষ্টিও করা যায় না ধ্বংসও করা যায় না; (2) একই মৌলের পরমাণুরা ভর ও রাসায়নিক ধর্মে একই রকম ; (3) ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুরা ভর ও ধর্মে আলাদা; (4) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন মৌলের পরমাণুরা পূর্ণসংখ্যার সরলানুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। ডালটনের পরমাণুবাদের সাহায্যে তাঁর নিজের ও সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কিছু পরীক্ষার ফলাফল বোঝা সম্ভব হলো। 1811 খ্রিস্টাব্দে অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো ডালটনের মতবাদের ত্রুটি সংশোধন করলেন। তিনি কল্পনা করলেন মৌলের পরমাণুরা জুড়ে অণু (molecule) তৈরি হতে পারে। বোঝা গেল রসায়নে পরমাণুর ধারণা কাজে লাগবে। উনবিংশ শতকে রসায়নবিদরা নানান মৌল আবিষ্কার, তাদের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষা, যৌগের সংকেত নির্ণয় এইসব কাজ করেছেন। এর ফলে রসায়নে পরমাণুর গুরুত্বের কথা বোঝা গেল।

আইজ্যাক নিউটন

জন ডালটন

অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি

আজকে তোমরা অনেকেই হয়তো জেনে ফেলেছ যে পরমাণুকেও ভাঙা যায়। এর মানে হলো ডিমোক্রিটাস থেকে ডালটন পরমাণুকে যেমন অবিভাজ্য কণা বলে ভেবেছিলেন পরমাণু আসলে তা নয়। পরমাণু তৈরি হয় কী দিয়ে? পরমাণু তৈরি হয় প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন এই তিনধরনের আরো ছোট্ট কণা দিয়ে। এদের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। প্রোটন আর নিউট্রন কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু-হাজার গুণ ভারী। এরা কবে আবিষ্কৃত হলো জানতে চাও?

1897 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে. জে. থমসনের পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। থমসন অবশ্য 'ইলেকট্রন' নাম দেননি, ইলেকট্রন নাম দিয়েছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ স্টোনী। ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জবাহী কণা তা বোঝার পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে পরমাণুতে নিশ্চয়ই সমপরিমাণ ধনাত্মক চার্জবাহী কণাও আছে। (তা নইলে পরমাণু নিস্তড়িৎ হয় কী করে?) 1913 সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করলেন যে, পরমাণুতে ইলেকট্রনের সমান কিন্তু ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাও থাকে। 1920 খ্রিস্টাব্দে তিনি এই কণার নাম দিলেন 'প্রোটন'।

আজ আমরা জানি নিউট্রন হলো আধানহীন কণা। 1932 খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ডের ছাত্র স্যাডউইক পরীক্ষামূলকভাবে নিউট্রন আবিষ্কার করেন।

পরমাণুর মডেল

পরমাণু ভীষণ ছোট্ট, কোনোভাবেই তার মধ্যের কণাগুলোর কোনটা কোথায় আছে তা সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন —

(1) পরমাণুর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা। (2) পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই তার মাঝখানে অতি অল্প জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তিনি এই ভারী অংশের নাম দিলেন নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রক। (3) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই তার সমস্ত ধনাত্মক চার্জ সীমাবদ্ধ থাকে। (4) নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো নানান বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। পরমাণু সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষালব্ধ ধারণাকেই 'রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল' বলা হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণু সম্বন্ধে যা বললেন আমরা সেই মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণুর চিত্র এঁকেছি।

H

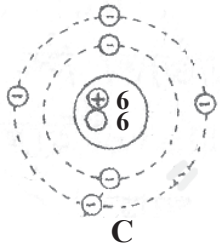

C

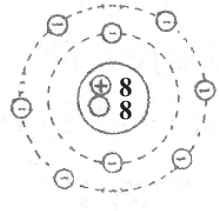

O

এখানে ⊕ দিয়ে প্রোটন, ⊖ দিয়ে ইলেকট্রন ও ◯ দিয়ে নিউট্রন বোঝানো হয়েছে। ছবিতে (+)6 মানে 6টি প্রোটন, ◯ 8 মানে 8টি নিউট্রন... এভাবে বুঝতে হবে। নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকতে পারে। এর কারণ এখানে 'নিউক্লীয় বল' নামে একটি শক্তিশালী আকর্ষণ বল কাজ করে যেটি বিকর্ষণ বল অপেক্ষা অনেক জোরালো।

কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic Number) বলে। নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভরসংখ্যা (Mass Number) বলা হয়।

মৌলের চিহ্নের বাঁদিকে একটু ওপরে ভরসংখ্যা ও বাঁদিকে একটু নীচে পরমাণু ক্রমাঙ্ক লেখা হয়। যেমন নাইট্রোজেন পরমাণুতে 7 টা প্রোটন ও 7 টা নিউট্রন আছে তাই একে লেখা হবে $^{14}_{7}N$।

- 'পরমাণুর ক্রমাঙ্ক' কথাটাকে সংক্ষেপে 'ক্রমাঙ্ক' বলা যায়। ওপরের ছবি থেকে বলো কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক

ও ভরসংখ্যা কত। চিহ্নের মাধ্যমে এই তথ্য তুমি কীভাবে প্রকাশ করবে দেখাও।

- নীচে তোমাদের লিথিয়াম,সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণুর ছবি দেখানো হলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা, পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত হবে তা নীচের সারণিতে লেখো।

পরমাণু	প্রোটন	ইলেকট্রন	নিউট্রন	ক্রমাঙ্ক	ভরসংখ্যা	চিহ্ন
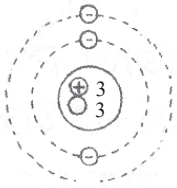 Li						
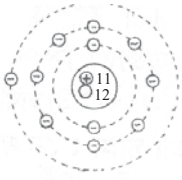 Na						
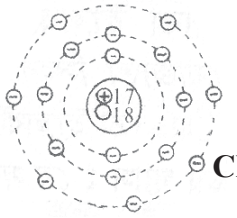 Cl						

আইসোটোপ ও আইসোবার

যেসব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা (= পরমাণু ক্রমাঙ্ক) সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদের পরস্পরের আইসোটোপ (Isotope) বলে। যথা : ${}_{1}^{1}\mathrm{H}$ (প্রোটিয়াম), ${}_{1}^{2}\mathrm{H}$ (ডয়টেরিয়াম), ${}_{1}^{3}\mathrm{H}$ (ট্রিশিয়াম বা ট্রিটিয়াম)। ভিন্ন মৌলের যেসব পরমাণুর ভরসংখ্যা (= নিউট্রনসংখ্যা + প্রোটনসংখ্যা) সমান তাদের পরস্পরের আইসোবার (Isobar) বলে। যথা : ${}_{1}^{3}\mathrm{H}$ ও ${}_{2}^{3}\mathrm{He}$; ${}_{6}^{14}\mathrm{C}$ ও ${}_{7}^{14}\mathrm{N}$ । আইসোবারদের ভরসংখ্যা সমান, কিন্তু প্রকৃত ভরে সামান্য পার্থক্য থাকে কারণ নিউট্রন ও প্রোটনের ভরে সামান্য পার্থক্য আছে।

একটু আগেই তোমরা যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কথা জানলে নীচে তাঁদের ছবি দেওয়া হলো।

জোসেফ জে. থমসন

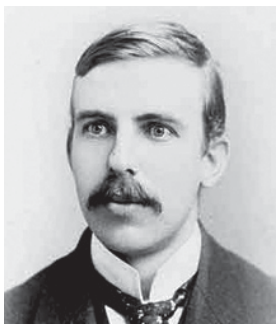

আর্নস্ট রাদারফোর্ড

নীলস বোর

জেমস স্যাডউইক

১. নীচে তোমাদের ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুর ছবি দেখানো হলো। এক্ষেত্রে পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা, পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত হবে তা নীচের সারণিতে লেখো।

পরমাণু	প্রোটন	ইলেকট্রন	নিউট্রন	পরমাণু ক্রমাঙ্ক	ভরসংখ্যা	মৌলের চিহ্ন
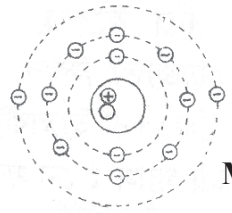 Mg						

২. আইসোবারগুলোকে শনাক্ত করো : ${}_{1}^{1}H$, ${}_{2}^{3}He$, ${}_{1}^{2}H$, ${}_{1}^{3}H$, ${}_{2}^{4}He$, ${}_{6}^{14}C$, ${}_{7}^{14}N$

- **পরমাণুরা কত ছোটো?**

তোমার জ্যামিতি বক্সের মিলিমিটার স্কেলটা বার করে দেখো এক মিলিমিটার জায়গাটা কতটুকু। এই স্কেল দিয়ে সবচেয়ে ছোট্ট কতটুকু দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে বলোতো? এক মিলিমিটার, তাই তো? ওই এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য তোমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসের তুলনায় সেটা এক কোটি গুণ বড়ো! তাহলে বোঝা গেল পরমাণুরা কত ছোট্ট হয়?

এবার পরমাণুদের ভরের কথায় আসা যাক। পদার্থবিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম ওজন যন্ত্রে এক মিলিগ্রাম সোনার ওজনও নেওয়া যায়। ওই এক মিলিগ্রাম সোনাতেও প্রায় 3×10^{18} সংখ্যক সোনার পরমাণু আছে। সোনা বেশ ভারী ধাতু, যদি তার চেয়ে হালকা হিলিয়াম পরমাণু হতো? তাহলে এক মিলিগ্রামে থাকত ওর প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি পরমাণু ($50 \times 3 \times 10^{18}$)!

আমরা খালি চোখে কোনো বস্তুর যতটুকু দেখতে পাই, হাতে নিতে পারি, ওজন করতে পারি তাতে বহু কোটি কোটি পরমাণু থাকে। খুব ছোট্ট হলেও পরমাণুদের একটুখানি ভর আর আয়তন আছে, না হলে চোখে দেখার মতো কোনো জিনিসের ভর আর আয়তন থাকত না। কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়েই পরমাণুদের ওজন সরাসরি মাপা যায় না। বিজ্ঞানীরা অনেক অন্য পরীক্ষা থেকে পরমাণুর ভর এবং আয়তন হিসেব করে বার করেছেন। পরমাণু জুড়ে জুড়েই অণু তৈরি হয়। যেকোনো অণুই হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে বড়ো, কিন্তু তাদেরও চোখে দেখা যায় না। অণুদের ভর বা আয়তনও সরাসরি মাপা যায় না। নানান পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে অণু বা পরমাণুর ভর নির্ণয় করেন।

- লোহার একটা পরমাণুর চেয়ে সোনার একটা পরমাণুর ভর বেশি। তাহলে এক মিলিগ্রাম লোহা না এক মিলিগ্রাম সোনা—কোথায় বেশি সংখ্যক পরমাণু থাকবে?

- **পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াস কতটা ছোটো?**

নিউক্লিয়াসের ব্যাসের তুলনায় পরমাণুর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। এর মানে হলো নিউক্লিয়াসকে **যদি** এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা মার্বেলের মতো বড়ো করে দেখা যেত তাহলে পরমাণুটা হতো একটা মস্ত বড়ো গোলক, যার ব্যাস এক কিলোমিটার!

পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

- **পদার্থের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে কীভাবে?**

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ বন্ধ ঘরে ধূপ জ্বালালে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ধূপ জ্বালালে কিছু উদবায়ী যৌগ বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। এইসব যৌগদের কোনো কোনোটার অণুরা যখন আমাদের নাকে ঢোকে তখন আমরা

সুগন্ধের অনুভূতি পাই। তাহলে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার মানে হলো গ্যাস অবস্থায় অণুদের ছড়িয়ে পড়া। একটা কাঁচের গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে তাতে এক ফোঁটা কালি ফেলো। জলটা রেখে দিলে দেখবে রংটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রং নিশ্চয়ই কোনো না কোনো যৌগের অণু দিয়ে তৈরি। তাহলে দেখা গেল তরলের মধ্যে দিয়েও অণুরা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

- **এই দুটো পরীক্ষা থেকে তুমি কী বলতে পারো?**

এ থেকে তুমি অন্তত বলতে পারো যে গ্যাসীয় এবং তরল অবস্থায় অণুরা থেমে থাকে না, তাদেরও গতি আছে। কঠিনের ক্ষেত্রে খালি চোখে দেখে বোঝার মতো এমন কোনো পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অণুদের নড়াচড়া বোঝা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা থেমে থাকে না। কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা নড়াচড়া করে। নীচের ছবিগুলোতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন দেখানো হয়নি, শুধু গোলক দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

কঠিন : কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে, আর পরস্পরের অনেক কাছাকাছি। ছবিতে অণু-পরমাণুরা ঠেসাঠেসি করে আছে বলে মনে হলেও আসলে পাশাপাশি থাকা অণু বা পরমাণুদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে। কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা কিন্তু মোটেই স্থিরভাবে থাকে না। যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই কিছুটা কাঁপতে পারে মাত্র। কঠিনের নিজস্ব আয়তন ও আকৃতি আছে।

তরল: তরলের মধ্যে অণুরা কঠিনের মতো ততটা সুশৃঙ্খলভাবে নেই। অণুরা এখন অল্প নড়াচড়া করতে, কাঁপতে আর পাক খেতে পারে। কঠিনের চেয়ে তরলের মধ্যে অণুদের মধ্যে দূরত্ব সামান্য বেশি। অণুদের নড়াচড়ার স্বাধীনতা কঠিনের চেয়ে সামান্য বেশি তাই তরলের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, যদিও নিজস্ব আয়তন আছে।

গ্যাস : গ্যাস হলো প্রায় বাঁধনছাড়া অবস্থা — অণুরা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, আর অনেক জোরে দৌড়োচ্ছে, কাঁপছে আর পাক খাচ্ছে। অণুদের দৌড়োদৌড়ির কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, একেবারেই এলোমেলো গতি। দৌড়োতে দৌড়োতে অণুরা একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, ছিটকে সরে যাচ্ছে, পাত্রের দেয়ালে গিয়েও ধাক্কা দিচ্ছে। এই অবিশ্রান্ত গতির জন্যই গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন বা আকৃতি নেই।

নীচের ছবিগুলো দেখে কঠিন, তরল ও গ্যাসের মধ্যে অণুদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো।

নীচের সারণির বাঁদিকের কথাগুলো ডানদিকের কথাগুলোর সঙ্গে ঠিকঠাক মিলিয়ে লেখো।

অবস্থা	ধর্ম
1. কঠিন	A. নির্দিষ্ট আয়তন এবং আকৃতি নেই
2. তরল	B. নির্দিষ্ট আকৃতি নেই , নিজস্ব আয়তন আছে
3. গ্যাসীয়	C. নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন আছে

উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন :

উষ্ণতা বাড়লে পদার্থের যেকোনো অবস্থাতেই অণু-পরমাণুদের গতিশক্তি বাড়ে। তাহলে দেখা যাক কোনো কঠিন বা তরলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়াতে থাকলে কী ঘটবে।

কঠিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি :

কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা যেকোনো উষ্ণতাতেই কাঁপে। কঠিনকে গরম করতে থাকলে অণু-পরমাণুদের কম্পনের মাত্রা এবং গতিশক্তিও বাড়ে। এক সময় সেই কম্পন এতই বেড়ে যায় যে অণু-পরমাণুদের আর কঠিন অবস্থায় ধরে রাখা যায় না। কঠিন তখন গলে গিয়ে তরল তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে বলে গলন (melting)।

তরলের উষ্ণতা বৃদ্ধি :

তরলকে গরম করতে থাকলে তরলের অণুদের গতিশক্তি বাড়তে থাকে। এক সময় অণুদের গতিশক্তি এতই বেড়ে যায় যে অণুদের মধ্যে আকর্ষণ বল আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তরল ফুটে তখন বাষ্প তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে আমরা বলব স্ফুটন (Boiling)।

কোনো কোনো কঠিন পদার্থকে খোলা হাওয়ায় গরম করলে তরল অবস্থাটা পাওয়া যায় না। খোলা হাওয়ায় গরম করা হলে এরা সরাসরি বাষ্প হয়ে যায়। এই জাতীয় পদার্থ হলো কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প হওয়াকে বলে উর্ধ্বপাতন (Sublimation)। উপযুক্ত উষ্ণতায় খুব কম চাপে রাখলে বরফেরও উর্ধ্বপাতন ঘটে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খোলা হাওয়ায় উর্ধ্বপাতিত হয় মানে কখনোই এদের তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না,তা কিন্তু নয়—উপযুক্ত উষ্ণতা ও চাপে এইসব পদার্থের তরল অবস্থা পাওয়া যেতে পারে।

কঠিন আর তরলের উষ্ণতা বাড়াতে থাকলে কী ঘটে তা তোমরা জানলে। কিন্তু যদি আমরা গ্যাসের উষ্ণতা আরও বাড়াতে থাকি তখন কী ঘটবে? খুব বেশি উষ্ণতায় গ্যাসের অণুরা ভেঙে পরমাণু হয়ে যাবে, তারপর এক সময় পরমাণু ছেড়ে ইলেকট্রনরাও আলাদা হয়ে যাবে। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল তখন আর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনদের ধরে রাখতে পারবে না। এই যে প্রচণ্ড গরম গ্যাসীয় অবস্থা যার মধ্যে আলাদা আলাদা হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন— একে বলা হয় প্লাজমা (Plasma)। প্লাজমাকে বলা যেতে পারে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। সূর্য এবং তারাদের উপাদান হলো এই উত্তপ্ত প্লাজমা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন সূর্যের কেন্দ্রে এই প্লাজমার উষ্ণতা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশে তোমাদের সূর্যের বাইরের দিকের ছবি দেখানো হলো।

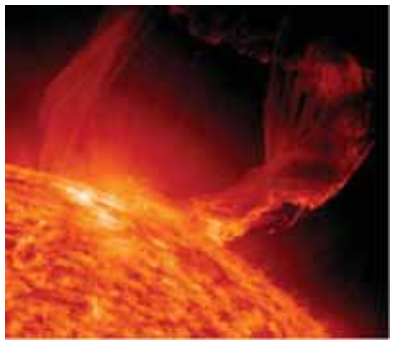

সূর্যের বাইরের দিকের ছবি

আমাদের চেনা অনেক যৌগ — নুন, পোড়াচুন, কস্টিক সোডা, কলিচুন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট — এরাও কঠিন পদার্থ। এরা কিন্তু অণু দিয়ে তৈরি নয়। এইসব যৌগ তৈরি হয় আয়ন দিয়ে। এবার আমরা আয়ন দিয়ে তৈরি যৌগদের কথা জানব।

যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

আয়নীয় যৌগ

তোমরা সকলেই নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখেছ। প্রথম ছবির নুনের একটা দানাকে যদি অনেকটা বড়ো করে দেখানো যায় তাহলে কী রকম দেখাবে? নীচের দ্বিতীয় ছবিটা দেখো—

নুন

নুনের ক্রিস্টাল

দ্বিতীয় ছবিতে যে বেশ সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতির নুনের দানাটাকে দেখা যাচ্ছে তাকে বলে কেলাস বা ক্রিস্টাল (Crystal)। নুন তো আমরা বাজার থেকে কিনে আনি। কিন্তু যদি আমরা পরীক্ষাগারে নুন তৈরি করতে চাই? তাহলে ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো:

$$\underset{\text{কঠিন}}{2Na} + \underset{\text{গ্যাস}}{Cl_2} \longrightarrow \underset{\text{কঠিন}}{2NaCl}$$

নুন তৈরিতে কী কী মৌল লাগে সে তো জানা গেল। এবার আমরা জানতে চাইব নুনের ওই ক্রিস্টালে কী থাকে। তার আগে নুনের একটা ধর্মের কথা জেনে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কঠিন অবস্থায় নুনের তড়িৎ পরিবাহিতা নগণ্য। কিন্তু প্রায় 800^0C তাপমাত্রায় নুনকে গলিয়ে তরল করে ফেলা যায়। গলে যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব। ধাতুর মতো অতো ভালো পরিবাহী না হলেও গলে-যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোভাবেই বিদ্যুৎ যেতে পারে। কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে হলে কোনো-না-কোনো আধানযুক্ত কণাকে যেতেই হবে। যেমন ধরো, ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া মানে ইলেকট্রন চলাচল। তাহলে কী গলে-যাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল ইলেকট্রনের মাধ্যমে ঘটে? — না; ইলেকট্রন চলাচল নয়; তাহলে?

কোনো পরমাণু ইলেকট্রন নিলে বা ছেড়ে দিলে কী হয়? সেক্ষেত্রে মোট প্রোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যার সমান থাকে না; পরমাণু তখন তড়িৎযুক্ত হয়ে পড়ে। তড়িৎযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন(ion)। আয়ন দু-ধরনের —ধনাত্মক আয়ন (ক্যাটায়ন) আর ঋণাত্মক আয়ন (অ্যানায়ন)। তাহলে কি গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ পরিবাহিতা তড়িতের প্রভাবে আয়নদের চলাচলের জন্যে?

— হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিন কেলাসে, গলে-যাওয়া অবস্থায় এবং জলীয় দ্রবণে সবসময়েই নুনের উপাদান হলো Na^+ আর Cl^- আয়ন। বিদ্যুৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করলে এই তড়িৎগ্রস্ত আয়নরাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত অবস্থায় বা জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহণ করে। নুনের গলিত অবস্থায় বা জলীয় দ্রবণের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করে না।

এবারে আমরা দেখব কীভাবে সোডিয়াম পরমাণু থেকে Na^+ আর ক্লোরিন পরমাণু থেকে Cl^- আয়ন তৈরি হয়।

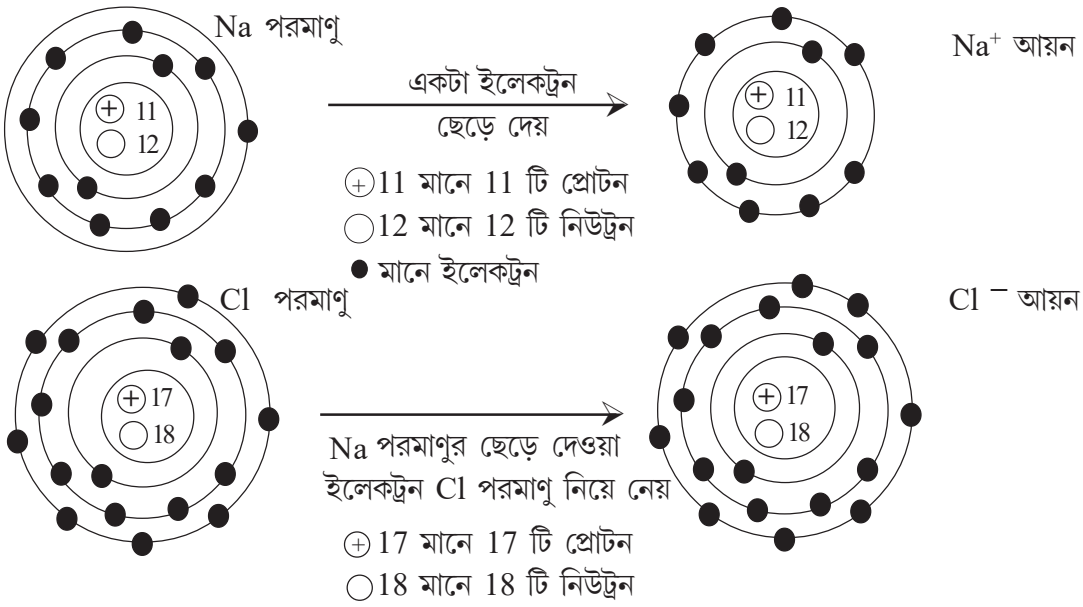

Na^+ আর Cl^- তো তৈরি হলো; কিন্তু কতগুলো আয়ন হয়েছে? শুধু দুটো আয়নই কি?

না; তোমরা জেনেছ যে চোখে দেখতে পাবার মতো যে-কোনো বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি অণু-পরমাণু অংশগ্রহণ করে। এখানেও তাই হয় ; আমরা তোমাদের বিষয়টা সহজে বোঝাতে একটা Na^+ আর একটা Cl^- আয়নের মডেল দেখিয়েছি। আসলে কিন্তু বহু কোটি Na^+ আর সমসংখ্যক Cl^- আয়ন দিয়ে ওই ক্রিস্টালটা তৈরি হয়েছে। ক্রিস্টালে বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদের মধ্যে তাড়িতিক আকর্ষণই আয়নদের একত্রে ধরে রাখে।

নীচে NaCl ক্রিস্টালের মধ্যে Na^+ আর Cl^- আয়নগুলো কেমনভাবে থাকে তার একটা মডেল দেখানো হলো।

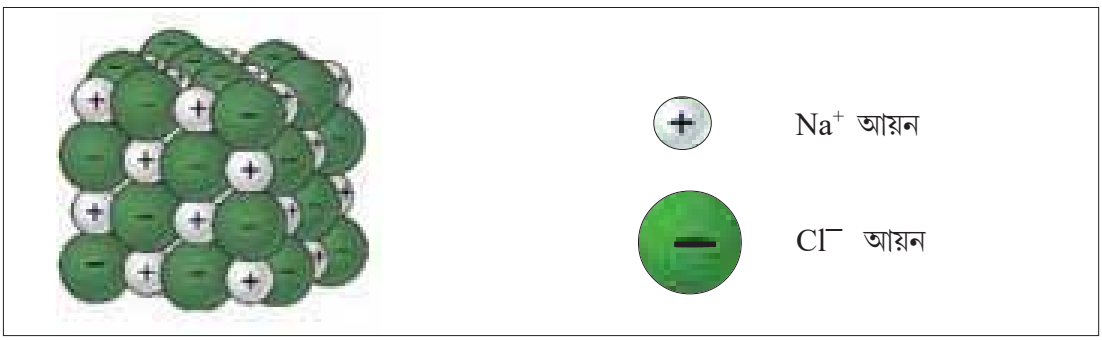

সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো একটা ধাতু (Na) আর একটা অধাতুর (Cl_2) যৌগ। ধাতু ও অধাতু দিয়ে তৈরি আরো বহু যৌগই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণ আছে। এদের বলা হয় আয়নিক যৌগ (Ionic compound)। যেসব আয়নিক যৌগ জলে দ্রাব্য হয় তাদের জলীয় দ্রবণ তড়িতের পরিবাহী হয়। কেলাসে বিপরীতধর্মী আয়নদের মধ্যে তীব্র তাড়িতিক বলই প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রে আয়নদের আপেক্ষিক সরণে বাধা দেয়। এই কারণেই কঠিন অবস্থায় আয়নীয় যৌগের তড়িৎপরিবাহিতা নগণ্য হয়। জলীয় দ্রবণে অথবা গলিত অবস্থায় প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে আয়নদের আপেক্ষিক সরণ ঘটা সম্ভব হয়। এই কারণে এই দুই অবস্থায় আয়নীয় যৌগের তড়িৎপরিবাহিতা বেশি হয়।

আমরা এবার আরো কিছু আয়নিক যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টা শিখব। এখানে দুটো কথা আমাদের মনে রাখতে হবে :

(1) কোনো আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে অণুর অস্তিত্ব নেই। তাই আমরা বলব NaCl, $CaCl_2$ ইত্যাদি হলো এইসব যৌগের সংকেত। 'NaCl-এর অণু' কথাটা তাই একেবারেই ঠিক নয়।

(2) যৌগ তৈরির সময় ক্যাটায়নদের মোট পজিটিভ চার্জ আর অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জ সমান হতেই হবে। এর মানে হলো যৌগে কোনো বাড়তি (+) বা (–) চার্জ থাকা চলবে না।

এবারে নীচের সারণির ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করে আয়নিক যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টা শিখে নাও :

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে	যৌগের সংকেত	যৌগের নাম
Na^+	Cl^-	প্রত্যেক Na^+ -এর জন্য 1টি Cl^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	NaCl	সোডিয়াম ক্লোরাইড
K^+	F^-	প্রত্যেক K^+ -এর জন্য — টি F^- আয়ন	_____	_____	পটাশিয়াম ফ্লুওরাইড
Mg^{2+}	O^{2-}	প্রত্যেক Mg^{2+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	MgO	ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড
Zn^{2+}	S^{2-}	প্রত্যেক Zn^{2+} -এর জন্য — টি S^{2-} আয়ন	_____	_____	জিঙ্ক সালফাইড
Ca^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$CaCl_2$	ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড
Na^+	O^{2-}	প্রতি দুটি Na^+ -এর জন্য --- টি O^{2-} আয়ন	_____	_____	সোডিয়াম অক্সাইড
Al^{3+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Al^{3+} -এর জন্য 3 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+3)+3\times(-2)=0$	_____	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

. **এবার তোমরা এই সারণির সাহায্য নিয়ে নীচের আয়নীয় যৌগদের সংকেত লেখো :** অ্যালুমিনিয়াম ফ্লুওরাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালশিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম সালফাইড।

আগের পাতার যেসব ধাতুর যৌগের কথা বলা হলো তারা একরকমের ক্যাটায়ন দেয়। আরো কিছু ধাতুর কথা আমরা জানব যারা একাধিক রকমের ক্যাটায়ন দেয়। এইরকম চারটে ধাতুর নাম হলো লোহা (Fe), তামা(Cu), মার্কারি (Hg) এবং টিন (Sn)। এইসব ধাতুর কম চার্জের আয়নের নামে 'আস্' ও বেশি চার্জের আয়নের নামে 'ইক' যোগ করে চার্জ কম-বেশির ব্যাপারটা বোঝানো হয়। নীচের সারণি দেখো।

লক্ষ করো মারকিউরাস আয়ন হলো Hg_2^{2+} অর্থাৎ এখানে দুটো Hg পরমাণু পরস্পর যুক্ত থাকে।

মৌল	কম চার্জের আয়ন ও তার নাম	বেশি চার্জের আয়ন ও তার নাম
Fe	Fe^{2+}, ফেরাস	Fe^{3+} ফেরিক
Cu	Cu^{+}, কিউপ্রাস	Cu^{2+}, কিউপ্রিক
Hg	Hg_2^{2+}, মারকিউরাস	Hg^{2+}, মারকিউরিক
Sn	Sn^{2+}, স্ট্যানাস	Sn^{4+}, স্ট্যানিক

এবার আগের মতো উপায়ে নীচের সারণি পূরণ করো :

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস ক্লোরাইড	Fe^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$FeCl_2$
ফেরিক ক্লোরাইড	Fe^{3+}	Cl^-	_____	_____	_____
কিউপ্রাস অক্সাইড	Cu^{+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Cu^{+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+1)+(-2)=0$	Cu_2O
কিউপ্রিক অক্সাইড	Cu^{2+}	O^{2-}	_____	_____	_____
মারকিউরাস ক্লোরাইড	Hg_2^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Hg_2^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	_____	_____

এবার উপরের সারণি দুটি কাজে লাগিয়ে পাশের যৌগদের সংকেত লেখো: কিউপ্রাস ক্লোরাইড, ফেরিক অক্সাইড, মারকিউরিক অক্সাইড, স্ট্যানাস ক্লোরাইড।

মূলক:

আমরা এতক্ষণ যেসব ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নদের কথা জেনেছি তাদের মধ্যে Hg_2^{2+} ছাড়া সবকটাই এক -পরমাণুক। অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন যে সবসময়েই এক-পরমাণুক হবে তা নয়। একাধিক পরমাণু জোটবদ্ধ হয়ে যে আয়ন তৈরি করে তাকে বলা হয় মূলক বা র‍্যাডিক্যাল (Radical)। পাশের পাতার সারণিতে কয়েকটি মূলকের নাম ও সংকেত বলা হলো।

মূলক	সংকেত	মূলক	সংকেত
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	হাইড্রক্সাইড	OH^-
নাইট্রেট	NO_3^-	বাইকার্বনেট	HCO_3^-
কার্বনেট	CO_3^{2-}	ফসফেট	PO_4^{3-}
সালফেট	SO_4^{2-}	সালফাইট	SO_3^{2-}

এবার আমরা আগের এবং উপরের সারণি কাজে লাগিয়ে কিছু যৌগের সংকেত লেখা শিখব।

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস সালফেট	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 1 টি SO_4^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	$FeSO_4$
অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট	Al^{3+}	NO_3^-	প্রত্যেক Al^{3+}-এর জন্য --- টি NO_3^- আয়ন	_____	_____
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	NH_4^+	NO_3^-	প্রত্যেক NH_4^+ -এর জন্য 1টি NO_3^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	NH_4NO_3
ক্যালশিয়াম ফসফেট	Ca^{2+}	PO_4^{3-}	প্রতি 3টি Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি PO_4^{3-} আয়ন	$3\times(+2)+2\times(-3)=0$	$Ca_3(PO_4)_2$

এবার নীচের যৌগগুলোর সংকেত লেখো : অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, ফেরিক সালফেট, কিউপ্রিক নাইট্রেট, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট, ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালশিয়াম সালফাইট।

মনে রেখো :

সারণিতে প্রত্যেক Ca^{2+}-এর জন্য 2টি Cl^- - জাতীয় কথা হলো আনুপাতিক হিসেবের কথা। এরা সকলেই আয়নিক যৌগ, অণু দিয়ে তৈরি নয়। সেই কারণেই সংকেত লেখার সময় আনুপাতিক হিসেবের কথা বলতে হচ্ছে। '$CaCl_2$-এর অণু' কথাটা তাই একেবারেই ঠিক নয়।

ইলেকট্রন ও প্রোটনের আধান পরিমাপযোগ্য রাশি এবং তার একক আছে। প্রোটন ও ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ সমান হলেও আধানের প্রকৃতি বিপরীত। প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম যে পরিমাণ আধানের বিনিময় ঘটা সম্ভব তার মান একটা ইলেকট্রনের আধানের মানের সমান। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুরা যে পরিমাণ আধানের বিনিময় করে তা ইলেকট্রনের আধানের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক। তাই আগের আলোচনায় আমরা যখন চার্জ +1, +2, +2, –2 ইত্যাদি কথাগুলো বলেছি তখন আসলে তা একটা অথবা দুটো ইলেকট্রনের আধানের সমপরিমাণ ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আধানকেই বোঝায়। আলোচনাকে সহজ রাখার জন্য আমরা বারবার এককসহ ইলেকট্রনীয় আধানের কথা উল্লেখ না করে শুধু চিহ্নসহ সংখ্যাই লিখেছি।

মনে রাখা জরুরি :

- অণুদের ভর বা আয়তন সরাসরি মাপা যায় না। নানান পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে অণু বা পরমাণুর ভর নির্ণয় করেন।
- আইসোবারদের ভরসংখ্যা সমান, কিন্তু প্রকৃত ভর সমান নয়, কারণ নিউট্রন ও প্রোটনের ভরে সামান্য পার্থক্য আছে।
- কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের অণু-পরমাণুরা কখনোই স্থির থাকে না।
- আয়নিক যৌগের গঠনগত একক হলো ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন।
- আয়নিক যৌগে অণুর কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই 'NaCl-এর অণু' কথাটা একেবারেই ঠিক নয়।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে অষ্টম শ্রেণির 'পদার্থের গঠন' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হলো— ক) CaCl খ) Ca_2Cl গ) $CaCl_3$ ঘ) $CaCl_2$

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ $^{206}_{82}Pb$ পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা _____।

২.২ $^{14}_{7}N$ ও $^{14}_{6}C$ পরস্পরের_____।

২.৩ একাধিক রকমের ক্যাটায়ন দেয় এমন একটি ধাতু হলো _____ ।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' দাও :

৩.১ কঠিন অবস্থায় অণু-পরমাণুরা থেমে থাকে না।

৩.২ তরলের নিজস্ব আকৃতি ও আয়তন আছে।

৪. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ একজোড়া পরমাণুর উদাহরণ দাও যারা পরস্পরের আইসোটোপ।

৪.২ কোনো মৌলের পরমাণুর ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা বলতে কী বোঝায়?

৪.৩ উর্ধ্বপাতিত হয় এমন দুটি কঠিনের নাম লেখো।

৪.৪ হাওয়ায় ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় অণুদের আচরণ সম্বন্ধে তুমি কী বলতে পারো?

৪.৫ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ ঘটে কীসের মাধ্যমে?

৪.৬ পরমাণু থেকে কীভাবে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন তৈরি হয়?

৪.৭ যৌগগুলোর সংকেত লেখো : অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, জিঙ্ক অক্সাইড।

৫. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ বিশেষ পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কী ধারণা করতে পেরেছিলেন?

৫.২ কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প অবস্থায় চলে যাওয়ার ঘটনাকে কী বলা হয়? তোমার চেনা একটি পদার্থের উদাহরণ দাও যার ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়?

5 জীবদেহের গঠন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- কোশের প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে।
- কলার প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কোশের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।

কোশ

একটা বাড়ি আর একটা জীবদেহ অনেকাংশে তুলনীয়। **এসো দেখা যাক একটা বাড়ি আর জীবদেহ কীভাবে ধাপে ধাপে গঠিত হয়—**

বাড়ি	জীবদেহ
↓	↓
ঘর	অঙ্গ (ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক)
↓	↓
দেয়াল, ছাদ, মেঝে	কলা
↓	↓
ইট	কোশ

→

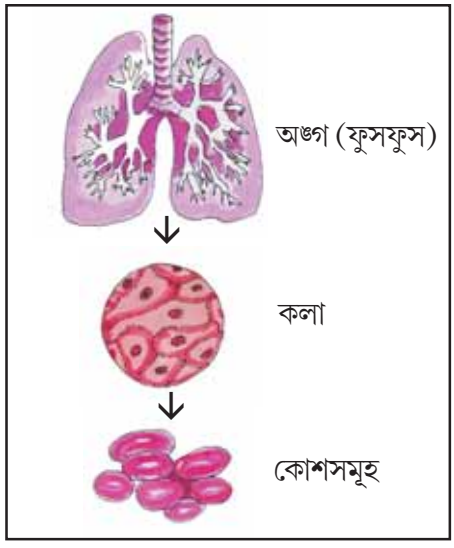

বাড়ির ক্ষুদ্রতম গঠনগত অংশ হলো ইট। তেমনি জীবদেহ গঠনেরও ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। জীবদেহ যে কাজগুলো করে তাও কোশেই সম্পন্ন হয়।

কোশ : কোশ হলো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম একক। এরা এতই ছোটো যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ ছাড়া সাধারণত খালি চোখে এদের দেখা যায় না।

❖ কোশ আবিষ্কারের কথা

বিজ্ঞানী রবার্ট হুক 1665 খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপে ওক গাছের কাণ্ডের ছালের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে দেখছিলেন। তিনি মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কুঠুরি লক্ষ করেন। তিনি এদের Cellulae (ল্যাটিন অর্থ ঘর) নাম দেন। পরে তিনি এদেরই কোশ (Cell) নামকরণ করেন।

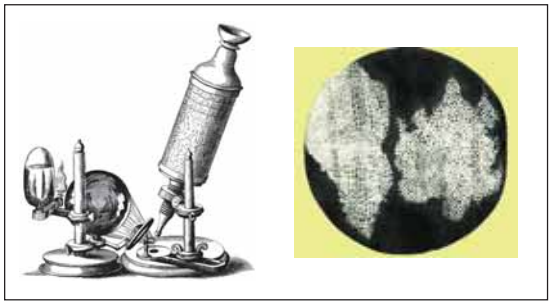

রবার্ট হুক যে কোশগুলি মাইক্রোস্কোপে দেখেছিলেন সেগুলি ছিল মৃত। 1674 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী লিভেনহুক প্রথম সজীব কোশ পর্যবেক্ষণ করেন।

❖ অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ

তোমরা জেনেছো যে খালি চোখে কোশ দেখা যায় না। কোশ দেখতে গেলে কোশকে অনেক গুণ বড়ো করে দেখতে হবে। এই কাজে ব্যবহার করা হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ। তবে এখনকার অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলো রবার্ট হুক বা লিভেনহুকের ব্যবহার করা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত ও শক্তিশালী।

প্রথমদিকে সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। তারপর এলো যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এদের চেয়েও উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

এসো এবারে এই তিন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধে জেনে নিই।

সরল, যৌগিক ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

সরল আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র	যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র
■ দৃশ্যমান আলোর সাহায্য নেওয়া হয়।	■ দৃশ্যমান আলো দ্বারা দ্রষ্টব্য বস্তুকে আলোকিত করা হয়। এর জন্য একটি বিশেষ ধরনের আয়নার সাহায্য নেওয়া হয়।	■ আলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ইলেকট্রন প্রবাহ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়।
■ একটি কাচের লেন্সের সাহায্য নেওয়া হয়।	■ দুটি কাচের লেন্স (অকিউলার লেন্স ও অবজেকটিভ লেন্স) ব্যবহার করা হয়।	■ কাচের লেন্সের পরিবর্তে তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করা হয়।
■ এর সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 15-20 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।	■ এর সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 2000-4000 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।	■ এর সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 50,000-3,00,000 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।
■ চোখ দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখা যায়।	■ চোখ দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখা যায়।	■ দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখার জন্য ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়।
■ ফুলের বিভিন্ন অংশ বড়ো করে দেখা যায়। 	■ ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাকসহ বিভিন্ন এককোশী ও বহুকোশী প্রাণীর দেহের বহির্গঠন, উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশের অন্তর্গঠন ইত্যাদি দেখা যায়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তার প্রস্থচ্ছেদ করে তার কলার গঠন জানা যায়। 	■ ভাইরাস ও অন্যান্য অণুজীবকে অনেক বড়ো করে দেখা সম্ভব। এছাড়াও কোশের মধ্যের অঙ্গাণুগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন জানা সম্ভব হয়।

❖ কোশের আকার ও আকৃতি

- কোনো জীবের আকার (size) যত বড়ো হয়, তার দেহে কোশের সংখ্যা তত বেশি হয়।
- অ্যামিবার দেহ একটি কোশ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ অ্যামিবার ক্ষেত্রে একটি কোশ একটি জীবদেহের সমতুল্য। এরা এককোশী।
- হাতির দেহ অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত। এরা বহুকোশী।

- বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে কোশের আকৃতি (Shape) বিভিন্ন ধরনের (যেমন— ডিম্বাকার, আয়তাকার, বহুভুজাকার, স্তম্ভাকার, সূত্রাকার ইত্যাদি) হতে পারে।

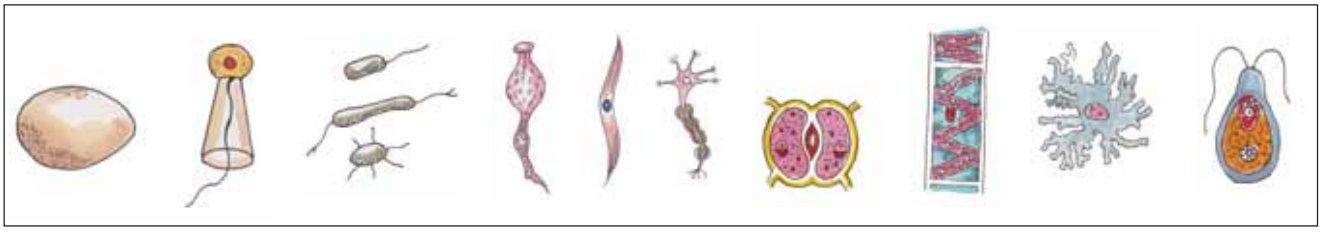

মানুষের দেহের কয়েক ধরনের কোশ

নাম	কেমন দেখতে	কাজ
লোহিত রক্তকণিকা	গোলাকার, দু-পাশ চ্যাপটা চাকতির মতো।	কোশের আকৃতি এরকম হওয়ায় বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালির মধ্য দিয়ে যাতায়াতে আর বেশি পরিমাণে O_2 পরিবহণে সুবিধা হয়।
পেশিকোশ	দু-প্রান্ত ছুঁচালো, মাঝখানটা চওড়া।	এই আকৃতির ফলে সংকোচন-প্রসারণে সুবিধা হয়। পেশিকোশের সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের স্থান পরিবর্তন, খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের স্থানান্তরণ, রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্তের সংবহন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়।
স্নায়ুকোশ	অন্যান্য কোশের তুলনায় স্নায়ু-কোশের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হয়। এর মূল কোশদেহটি তারার মতো বা গোলাকার হয় এবং তার সঙ্গে নানা আকৃতির শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে।	এরা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা (আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চাপ, তাপ, ব্যথা ইত্যাদি) গ্রহণ করে ও তা পরিবহণ করে। এভাবে জীবদেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

❖ **কোশের আকার (Size) কীভাবে মাপা হয়?**

কোশের আকার সাধারণত মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন দিয়ে মাপা হয়। 1 মাইক্রোমিটার 1 মিটারের 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ। 1 মিটার = 1000 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটার = 1000 মাইক্রোমিটার, 1 মাইক্রোমিটার (μm) = 1000 ন্যানোমিটার এবং 1 ন্যানোমিটার (nm) = 10 অ্যাংস্ট্রম (Å)। এই হিসেবে কোনো বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন (Full Stop) আমরা ব্যবহার করি তাতে 1 মাইক্রন মাপের 400 টি কোশ এঁটে যায়। অধিকাংশ কোশের আকার 5-10 মাইক্রন।

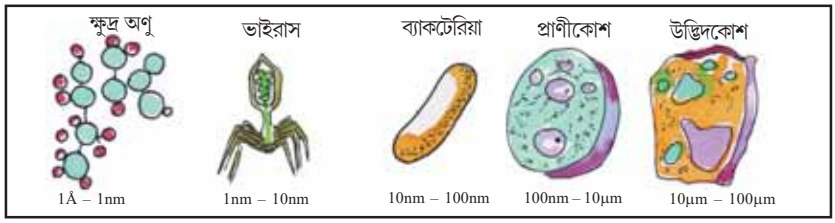

জেনে রাখো : হাতির দেহের কোশ কী ইঁদুরের দেহের কোশের তুলনায় বড়ো?

কোশের আকারের (Size) সঙ্গে জীবদেহের আকারের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কোশের আকৃতি (Shape) বরং কোশের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হাতি ও ইঁদুর উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত। উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ উদ্দীপনা গ্রহণ ও উত্তেজনা পরিবহণের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত।

কলা

কোশের আকার, আকৃতি ও গঠন কোশের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাজন ঘটার ফলে বিভিন্ন ধরনের কোশসমষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। এই কোশসমষ্টিই হলো কলা।

জীবদেহ গঠনের ধাপগুলো মনে করে দেখো—

জীবদেহ → অঙ্গতন্ত্র → অঙ্গ → কলা → কোশ

প্রত্যেকটি অঙ্গ একাধিক কলা নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলা আবার একইরকম কাজ করতে পারে এরকম কোশের সমষ্টি।

উদ্ভিদ কলা ও প্রাণীকলার প্রকারভেদ জেনে নেওয়া যাক।

উদ্ভিদ কলা

ভাজক কলা

• নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করা, • মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা, • নতুন পাতা, কাক্ষিক মুকুল ও শাখা উৎপন্ন করা।

স্থায়ী কলা

• খাদ্য সংশ্লেষ, সঞ্চয় ও পরিবহণ করা, • জল সংবহন করা, • ভারবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করা।

প্রাণী কলা

আবরণী কলা

• দেহের বাইরে ও ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গের মুক্ততলের ওপর প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন গঠন করা, • বহিঃকঙ্কাল (আঁশ, রোম, নখ, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি) গঠন করা।

যোগ কলা

• বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, • প্রতিরক্ষা প্রদান করা, • ফ্যাট সঞ্চয় করা।

স্নায়ু কলা

• সংবেদন গ্রহণ করা, • উদ্দীপনা পরিবহণ করা।

পেশি কলা

• অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটানো, • গমনে সাহায্য করা, • পৌষ্টিকনালির ও মূত্রনালির ক্রমসংকোচন ঘটানো।

প্রাণী ও উদ্ভিদ কোশের বিভিন্ন অংশ

এবারে এসো জানা যাক, একটা জীবকোশের গঠনে সাধারণভাবে কী কী অংশ থাকে।

- ❖ তোমরা ঠোঁটের ভেতরের দিক বা গালের পাশের অংশ একটা পরিষ্কার টুথপিকের সাহায্যে তুলে নাও। তারপর একটা গ্লাস স্লাইডের মাঝখানে টুথপিকের মাথাটা ভালো করে ঘষে নাও।
- ❖ এবার একফোঁটা মিথিলিন ব্লু (কোশকে দেখতে সাহায্য করে এমন রঞ্জক) স্লাইডের ওপর ফেলে কভার স্লিপ দিয়ে ভালোভাবে চাপা দাও।

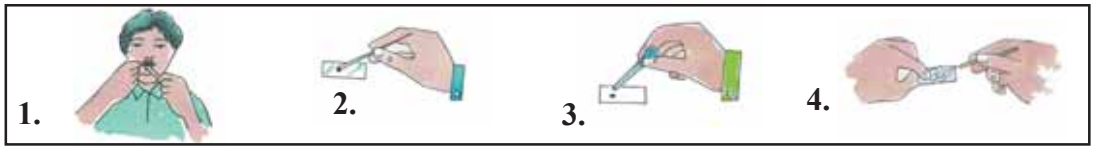

এবার মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে তুমি কী দেখতে পাবে?

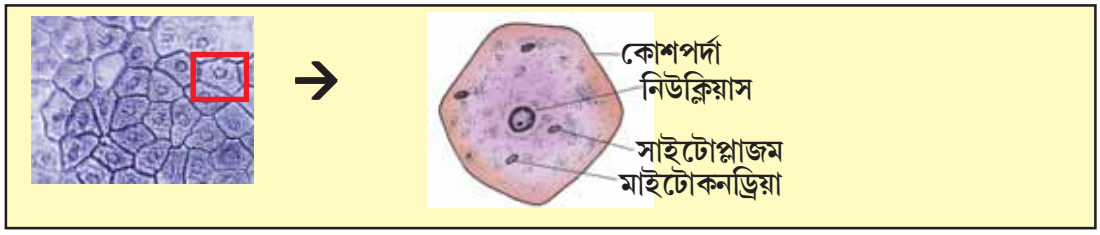

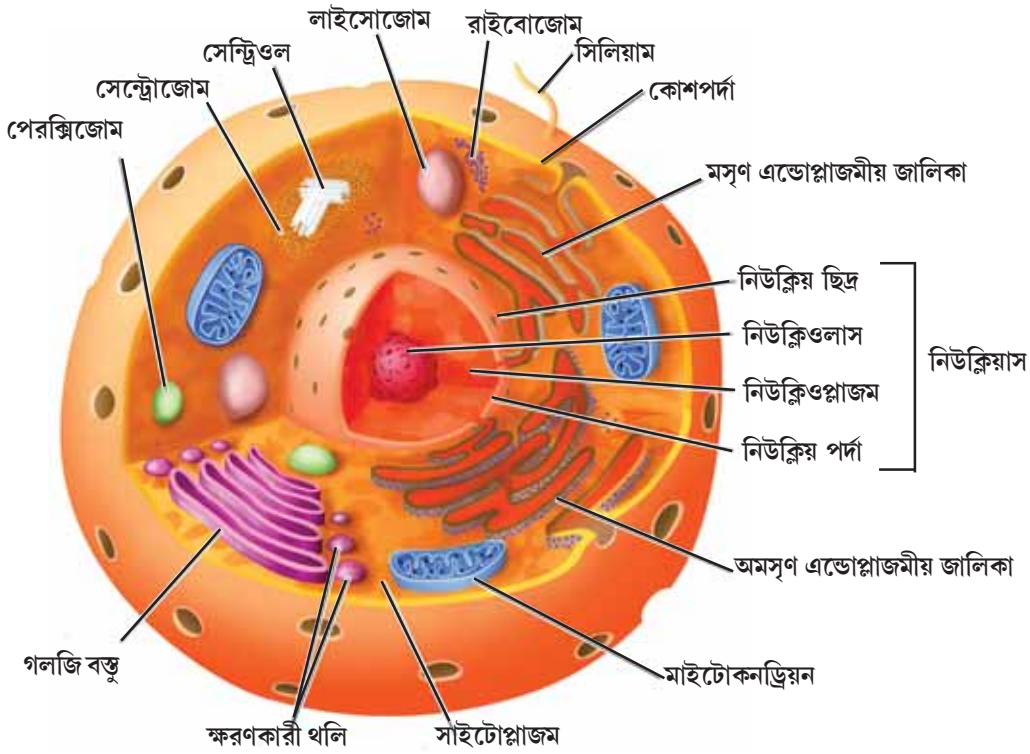

একটি প্রাণীকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র

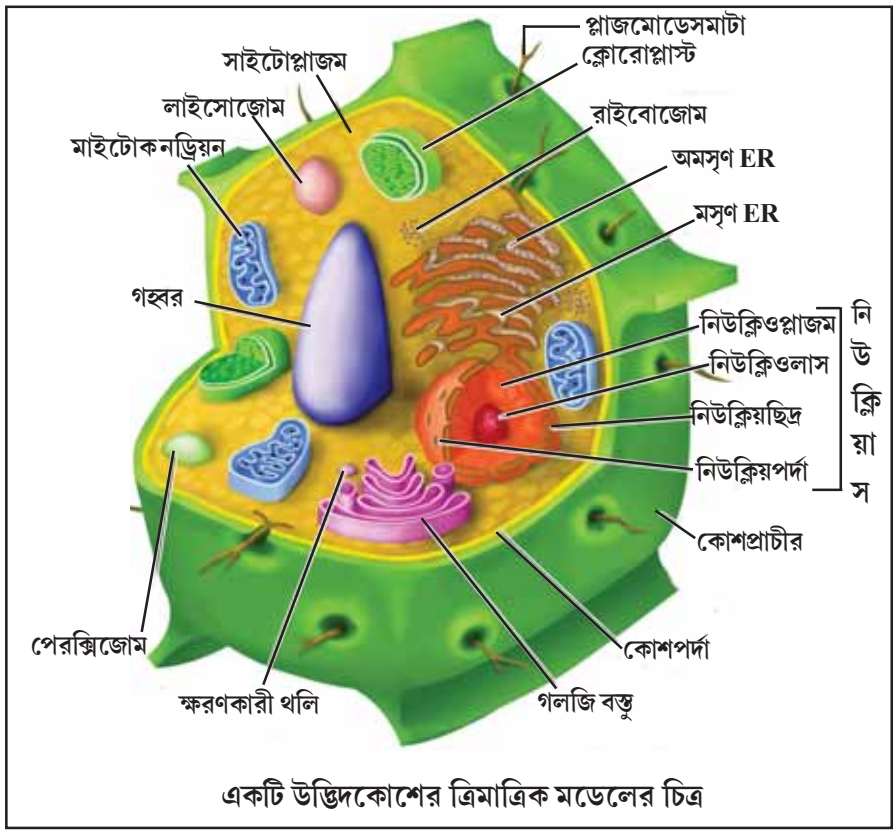

একটি উদ্ভিদকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র

কোশের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ

অংশের নাম	চিত্র	গঠন	কাজ
কোশপর্দা	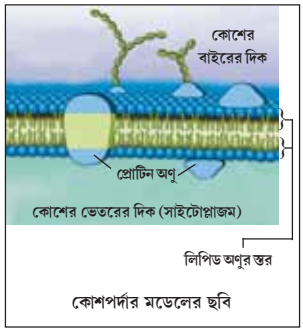 কোশপর্দার মডেলের ছবি	■ প্রোটিন ও লিপিড অণু দিয়ে তৈরি পর্দা কোশকে ঘিরে রাখে। ■ দুটি লিপিড স্তরের মাঝে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন অণু ভাসমান অবস্থায় থাকে।	• কোশকে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। • কোশের বাইরে ও ভেতরে বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদানে সাহায্য করে।
কোশপ্রাচীর		■ উদ্ভিদকোশের বাইরে পুরু, শক্ত এবং দৃঢ় অংশবিশেষ।	• কোশকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়। • উদ্ভিদকোশকে অতিরিক্ত সুরক্ষা দেয়।

অংশের নাম	চিত্র	গঠন	কাজ
সাইটোপ্লাজম	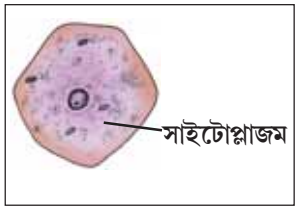	■ কোশ-মধ্যস্থ জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থ, যার মধ্যে বিভিন্ন কোশীয় অঙ্গাণুগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে।	• কোশের বিভিন্ন বিপাকীয় বিক্রিয়া সাইটোপ্লাজমে হয়।
নিউক্লিয়াস		চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। ■ **নিউক্লিয় পর্দা —** নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকা পর্দা বিশেষ। ■ **নিউক্লিওপ্লাজম —** নিউক্লিয় পর্দা দিয়ে ঘেরা তরল অংশ। ■ **ক্রোমাটিন জালিকা —** নিউক্লিয়াসের ভেতরে একধরনের সূক্ষ্ম জালকাকার গঠন দেখা যায় যা সুতোর মতো একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে। এই গঠনগুলো হলো DNA এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি ক্রোমাটিন। ক্রোমাটিন নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরিস্থিতি অনুসারে গোটানো বা আংশিক খোলা অবস্থায় থাকে। আংশিক খোলা অবস্থায় সেটিকে সুতোর জালের মতো দেখায়। তখন একে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয়। DNA এবং প্রোটিনের গোটানো গঠনগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। ■ **নিউক্লিওলাস —** নিউক্লিয়াসে থাকা ঘন গোলাকার বস্তু।	• কোশের মধ্যে ঘটা নানা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। • DNA অণুর বিশেষ অংশ যা প্রোটিন তৈরির সংকেত হিসেবে কাজ করে তাকে জিন বলে। জিনের মাধ্যমে পিতামাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য বাহিত হয়।

অংশের নাম	চিত্র	গঠন	কাজ
মাইটোকনড্রিয়া		■ দুটি প্লাজমা পর্দাবেষ্টিত অঙ্গাণু। ■ আকৃতিতে গোলাকার, ডিম্বাকার বা রডের মতো। ■ এর ধাত্রের মধ্যে নানা ধরনের উৎসেচক, রাইবোজোম ও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) থাকে। ■ অন্তঃপর্দা ভাঁজ হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক, ক্রিস্টি গঠন করে।	• শক্তি নির্গমন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা	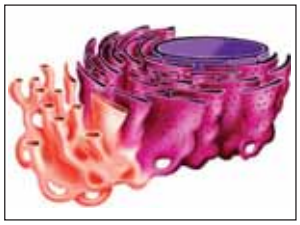	■ এরা প্লাজমা পর্দা থেকে উৎপন্ন হয়ে নিউক্লীয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ■ পর্দাবেষ্টিত বিভিন্ন আকৃতির নলাকার অংশ। ■ পর্দাগুলি অমসৃণ বা রাইবোজোমযুক্ত এবং মসৃণ বা রাইবোজোমবিহীন হতে পারে।	• সাইটোপ্লাজমকে কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে ভাগ করে। • বিভিন্ন কোশীয় বস্তু (প্রোটিন ও লিপিড) সংশ্লেষ, পরিবহণ ও সঞ্চয় করে।
গলজি বস্তু		■ চ্যাপটা থলি, লম্বা থলি বা ছোটো গহ্বরের মতো গঠনযুক্ত অঙ্গাণু। ■ এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে।	• কোশ-মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তুর (হরমোন ও উৎসেচক) পরিবহণ ও ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে।
লাইসোজোম		■ পর্দাবেষ্টিত থলির মতো অংশ। ■ থলির মধ্যে জীবাণু ধ্বংসকারী উৎসেচক থাকে। ■ কোশের মধ্যে এটি নানা রূপে অবস্থান করে (লাইসোজোমের বহুরূপতা)।	• উৎসেচকের সাহায্যে জীবাণু ও পুরোনো জীর্ণ কোশকে ধ্বংস করতে পারে। তাই লাইসোজোমকে 'আত্মঘাতী থলি' বলে।

অংশের নাম	চিত্র	গঠন	কাজ
রাইবোজোম	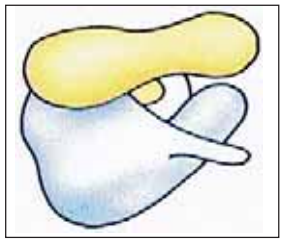	■ পর্দাবিহীন অঙ্গাণু। ■ সাইটোপ্লাজমে, কয়েকটি অঙ্গাণুর ভেতরে (মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাসটিড) কিংবা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ও নিউক্লিয়পর্দার বাইরের দিকে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে।	• প্রোটিন সংশ্লেষ করা প্রধান কাজ।
সেন্ট্রোজোম		■ পর্দাবিহীন অঙ্গাণু, প্রাণীকোশে থাকে।	• কোশ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।
প্লাসটিড	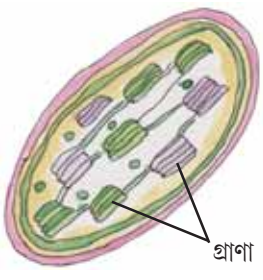 ক্লোরোপ্লাসটিডের **বিবর্ধিত** চিত্র 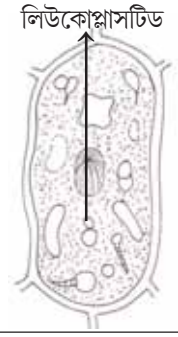	■ পর্দাবৃত গঠন যা উদ্ভিদকোশে থাকে। ■ তিন ধরনের হয়— ♦ **ক্লোরোপ্লাসটিড** • এর মধ্যে গ্রাণা নামক এক বিশেষ গঠন দেখা যায়। • ক্লোরোপ্লাসটিডের ধাত্রেও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA)। • এদের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদের নানা অঙ্গ সবুজ বর্ণের হয়। ♦ সবুজ ছাড়া অন্য বর্ণের **ক্রোমোপ্লাসটিড** (লাল, কমলা, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণ) ♦ **লিউকোপ্লাসটিড** • এরা বর্ণহীন।	• ক্লোরোপ্লাসটিড সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। • ক্রোমোপ্লাসটিড ফুল ও ফলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। • লিউকোপ্লাস্টিড নানা ধরনের খাদ্য সঞ্চয় করে।

অংশের নাম	চিত্র	গঠন	কাজ
কোশগহ্বর		■ কোশরস-পূর্ণ গহ্বর। ■ সাধারণত উদ্ভিদকোশে গহ্বরের আকৃতি বড়ো, প্রাণীকোশে গহ্বরের আকৃতি ছোটো।	• কোশের রেচনে ও বিভিন্ন বস্তুর সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

মনে রাখা জরুরি :

- কোশ হলো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম একক।
- কোশ এতই ছোটো যে কোশকে দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নিতে হয়।
- ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ইলেকট্রন প্রবাহ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়।
- একইরকম কাজ করতে পারে এরকম কোশসমষ্টিই হলো কলা।
- কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম গঠনকে অঙ্গাণু বলা হয়।
- মাইটোকনড্রিয়া শক্তি নির্গমন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'জীবদেহের গঠন' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

যে কোশীয় অঙ্গাণু খাদ্য থেকে শক্তিকে মুক্ত করতে সাহায্য করে তা হলো — (ক) নিউক্লিয়াস (খ) গলজি বস্তু (গ) মাইটোকনড্রিয়া (ঘ) লাইসোজোম।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

লাইসোজোমকে _____ থলি বলা হয়।

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ এককোশী প্রাণী দেখার জন্য তুমি কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করবে?

৩.২ কোন বৈজ্ঞানিক 'কোশ' আবিষ্কার করেন?

৪. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ উদ্ভিদদেহে কী কী ধরনের কলা দেখা যায়?

৪.২ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার কাজ উল্লেখ করো।

6 মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ফসলের প্রকারভেদ তালিকাভুক্ত করতে পারবে।
- কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধাপগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ধান ও চা চাষের প্রাথমিক ধারণা আলোচনা করতে পারবে।
- মাছ চাষ ও মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

কৃষিবিজ্ঞান

❖ আমরা উদ্ভিদজাত (ভাত, ডাল) এবং প্রাণীজাত (দুধ, ডিম, মাছ, মাংস) বিভিন্ন খাদ্যগ্রহণ করে থাকি।

❖ উন্নতমানের এবং যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদজাত এবং প্রাণীজাত খাদ্য পাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানের যে শাখায় খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটি হলো **কৃষিবিজ্ঞান** (Agriculture)।

কৃষিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি হলো—

- মাটির ব্যবস্থাপনা
- ফসল উৎপাদন
- ফল, ফুল, সবজি চাষের পদ্ধতি
- পশুপালন

❖ অনেকটা জায়গা জুড়ে একই ধরনের উদ্ভিদ যখন চাষ করা হয় তখন ওই উদ্ভিদদের একসঙ্গে বলা হয় **শস্য** বা **ফসল**।

❖ বিভিন্ন ধরনের ফসলের তালিকা নীচে দেওয়া হলো। তোমার জানা আরও কিছু ফসলের নাম সারণিতে যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. তণ্ডুল জাতীয় ফসল	ধান, গম, ...
2. তন্তু জাতীয় ফসল	তুলো, পাট, ...
3. ডাল জাতীয় ফসল	মটর, বীন, ...
4. তৈলবীজ পাওয়া যায় এমন ফসল	সরষে, সূর্যমুখী, ...
5. কন্দ জাতীয় ফসল	আলু, আদা, ...
6. চিনি পাওয়া যায় এমন ফসল	আখ, ...
7. বাগানে চাষ করা যায় এমন ফসল	চা, কফি, রবার, ...
8. ওষুধ পাওয়া যায় এমন গাছ	তুলসী, ...
9. মশলা পাওয়া যায় এমন গাছ	গোলমরিচ, আদা, ...

❖ ফল ও সবজি চাষের পদ্ধতি নিয়ে কৃষিবিজ্ঞানেরই আর একটি শাখা **উদ্যানবিজ্ঞানে** আলোচনা করা হয়।

❖ নীচের তালিকায় উদ্যানবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ফসলগুলি দেখানো হলো। তোমরাও তার সঙ্গে আরও কিছু নাম যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. সবজি	টম্যাটো, বাঁধাকপি, ...
2. ফল	কলা, আঙুর, ...
3. আলংকারিক উদ্ভিদ	ক্যাকটাস, বোগেনভেলিয়া, ...
4. ফুল	গোলাপ, জুঁই, ...

ঋতু অনুযায়ী চাষযোগ্য ফসল

খারিফ ফসল

বর্ষার শুরুতে (জুন/জুলাই) চাষ আর বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর) ফসল তোলা হয়। যেমন- ধান, ভুট্টা, তুলো, চিনেবাদাম, সয়াবীন।

রবি ফসল

শীতের শুরুতে (অক্টোবর/নভেম্বর) চাষ শুরু আর গরমের শুরুতে (মার্চ/এপ্রিল) ফসল তোলা হয়। যেমন- গম, বার্লি, ছোলা, মটর, সরষে।

ফসল উৎপাদন

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষক বা চাষিকে বেশ কিছুটা সময় জুড়ে নানারকম কাজ করে যেতে হয়। একজন কৃষক এই যে কাজগুলো করেন, এটাই হলো **কৃষিকাজ** (Agricultural practices)। এই কাজগুলো নীচে দেওয়া হলো। আমরা একে একে এইসব কাজগুলো সম্বন্ধে এরপর জানব।

1. **চাষের জমির মাটি তৈরি করা**
2. **বীজ বপন করা / বীজ বোনা**
3. **সার প্রয়োগ**
4. **জলসেচ**
5. **আগাছা দমন**
6. **ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো**
7. **ফসল তোলা**
8. **ফসল সঞ্চয় করে রাখা**

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা (Preparation of soil of cultivable land)

বীজের অঙ্কুরোদগম আর উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার মাধ্যম হলো মাটি। উদ্ভিদেরা জল আর নানান খনিজ মৌল পায় মাটি থেকে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের মাটি। তাই কোনো ফসলের চাষ শুরু করার আগে মাটিকে চাষের উপযোগী করে তোলা খুবই জরুরি। চাষের জমির মাটিকে তাই ওপর-নীচ করা হয়। এর ফলে উদ্ভিদের মূল সহজেই মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাটিতে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু, পচা-গলা জৈব বস্তু আর বিভিন্ন জীব। মাটি আলগা করলে, মাটিতে বায়ু চলাচল হলে তা কেঁচো আর মাটিতে বাস করা জীবাণুদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়। ওইসব জীবেরা যে মাটিকে শুধু আরও আলগা করতে সাহায্য করে তাই নয়, এরা মাটির জৈব অংশ যা **হিউমাস** বাড়াতেও সাহায্য করে। **এইসব জীবেরা কৃষকের বন্ধুর মতোই কাজ করে।** মাটিতে বাস করা কিছু জীবাণু মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দেহকে পচিয়ে

ওইসব জীবের দেহের নানা যৌগ আর মৌলগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এগুলোই উদ্ভিদের **পুষ্টি উপাদান** (nutrients), যা উদ্ভিদেরা মাটি থেকে গ্রহণ করে। মাটির ওপরের দিকের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার পুরু স্তরটাই উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই নীচের মাটি ওপরে আনলে বা ওপরের মাটি নীচে পাঠালে আর মাটি আলগা করে দিলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটির ওপরের দিকে চলে আসে। ফলে উদ্ভিদেরা ওই যৌগ আর মৌলগুলোকে সহজেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

লাঙল

সহজ কথায় জমি চষা আর ভালো বাংলায় বললে ভূমিকর্ষণ করা। জমি চষতে লাগে লাঙল। জমি চষা, মাটিতে সার মেশানো বা মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো নানান কাজে লাঙল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে দেশি কাঠের তৈরি লাঙলের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে লোহার তৈরি লাঙল। নিড়ানির সাহায্যে চাষের জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা আর মাটি আলগা করার কাজ করা হয়।

নিড়ানি

ট্রাক্টর ও কর্ষক

বর্তমানে বড়ো বড়ো চাষের জমি কর্ষণ করতে ট্রাক্টরের সাহায্য নেওয়া হয়। ট্রাক্টরের পেছনে লাগানো কর্ষকের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই অনেকটা জমি চষে ফেলা যায়।

2. বীজ বপন/ বীজ বোনা (Sowing of Seeds)

বীজ বপন বা বীজ বোনা হলো চাষের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বীজ বপনের আগে দেখে নেওয়া দরকার বীজগুলো ভালো গুণের অধিকারী অর্থাৎ বীজগুলো সুস্থ, খরা ও অতিবৃষ্টি-সহনক্ষম আর সংক্রমণ-মুক্ত কিনা। বেশি ফলন দেবে এমন বীজই চাষিরা পছন্দ করেন।

ভালো, সুস্থ বীজ আর খারাপ বীজ চিনবে কী করে? এসো একটা ছোটো পরীক্ষা করে দেখি।

একটা গ্লাস বা বিকারে জল অর্ধেক ভরতি করো। একমুঠো গমের বীজ নিয়ে জলে ফেলে ভালো করে নাড়ো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। কী দেখতে পেলে নীচের সারণিতে লেখো।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো

সংক্রমণ বা অন্যান্য কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজের ভেতরটা ফাঁপা। তাই নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজগুলো হালকা বলে জলে ভেসে থাকে। আর ভালো, সুস্থ বীজগুলো ভারী হওয়ার জন্য জলে ডুবে যায়।

এখনকার দিনে জমিতে বীজ বোনার জন্য উন্নত **বীজ বপন যন্ত্র** ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে সঠিক দূরত্ব এবং গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হলে বীজগুলো সবসময়ই মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে পাখিরাও আর ওই বীজের নাগাল পায় না। সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

বীজ বপন যন্ত্র

অনেক সময় বীজ বোনার আগে চাষিরা বীজগুলোকে কোনো কোনো রাসায়নিকে ডুবিয়ে নেন। ওই রাসায়নিক পদার্থগুলো বীজগুলোকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়। ধান বা কিছু সবজির (টম্যাটো, পিঁয়াজ) বীজ প্রথমে বীজতলায় বোনা হয়। এরপর বীজতলায় চারাগাছগুলো কিছুটা বড়ো হলে, তাদের মধ্যে থেকে সুস্থ, সবল আর নীরোগ চারাগাছ বেছে নিয়ে চাষের জমিতে লাগানো হয়। ফলে উন্নত মানের চারাগাছ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিস্থাপিত চারাগাছগুলোও মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। ফলে ফলনও বাড়ে।

3. সার প্রয়োগ (Adding manures and fertilizers)

উদ্ভিদের ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলের — এরাই হলো **উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান** (nutrients)। উদ্ভিদের এই পুষ্টি উপাদানগুলো আবার দু-ধরনের হয়।

- **মুখ্য খাদ্য উপাদান (Macronutrients) :** C, H, O, N, P, K, Mg, S।
- **গৌণ খাদ্য উপাদান (Micronutrients) :** Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn, Cl।

এইসব পুষ্টি উপাদানগুলোকে মৌল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এগুলো আসলে যৌগ হিসাবে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়। মাটি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো সরবরাহ করে। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই জরুরি।

একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো হলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো ফুরিয়ে আসে। তাই চাষের জমিতে সার মেশাতে হয়। যাতে মাটি উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়। অর্থাৎ মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পুষিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হয় যেসব পদার্থ, তারাই হলো **সার**। এই সার আবার দু-রকমের হয়। **জৈব সার** আর **অজৈব সার**।

জৈব সার (Organic manure)

মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পচিয়ে তৈরি হয় জৈব সার। চাষিরা খোলা জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পদার্থ ফেলে রাখেন পচে যাওয়ার জন্য। ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাকের বিয়োজন ও রূপান্তর ক্রিয়ায় ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো পচে গিয়ে তৈরি হয় জৈব সার।

অজৈব সার (Inorganic fertilizer)

অজৈব সার হলো একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এতে থাকে নানা অজৈব লবণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সার কারখানায় তৈরি হয় অজৈব সার। অজৈব সার প্রধানত তিন ধরনের মৌলের ঘাটতি পূরণ করে— নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) আর পটাশিয়াম (K)। NPK সারে এই তিনটি প্রধান উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় মেশানো থাকে। আবার কখনও বা কোনো অজৈব সারে এই তিনটি উপাদানের যে-কোনো একটা উপাদান উপস্থিত থাকে। যেমন পটাস সার বা সুপার ফসফেট। আরও কয়েকটা অজৈব সার হলো ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট।

নিজে করো

ছোলা, মুগ বা অন্য যে-কোনো তিনটে একই উচ্চতার একই ধরনের চারাগাছ নাও। তিনটে ফাঁকা গ্লাস নাও। গ্লাসগুলোতে 1, 2, 3 নম্বর দাও। 1 নং গ্লাসে অল্প একটু ইউরিয়া মেশানো মাটি নাও। 2 নং গ্লাসে অল্প একটু গোবর সার মেশানো মাটি নাও। খেয়াল রেখো যাতে 1 আর 2 নং গ্লাসে নেওয়া মাটির পরিমাণ একই হয়। 3 নং গ্লাসে একই পরিমাণ মাটি নাও। এই মাটিতে কিছু মিশিও না। তিনটে গ্লাসের মাটি একই জায়গা থেকে নিও। তিনটে গ্লাসে সমপরিমাণ জল দাও। এবারে তিনটে চারাগাছ তিনটে গ্লাসে বসিয়ে দাও। প্রতিদিন নিয়ম করে গ্লাসগুলোতে পরিমাণ মতো জল দাও। 7 - 10 দিন ধরে তিনটে গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করো।

কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

দিন	1ম গ্লাস	2য় গ্লাস	3য় গ্লাস	মন্তব্য

10 দিন পরে

- চারাগাছের বৃদ্ধি সব গ্লাসে কি একই হারে হয়েছে?
- কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়েছে?
- কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছে? এরকম হওয়ার পেছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়?

অজৈব সার ব্যবহারের সমস্যা

অজৈব সারের ব্যবহার, চাষিদের বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, গম আর ভুট্টার খুব ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে। কিন্তু অজৈব সারের অত্যধিক আর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করে মাটির উর্বরাশক্তি বা উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অজৈব সার ব্যবহার না করলে মাটির রসায়ন পালটে গিয়ে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যেমন— অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2\ SO_4]$ ব্যবহার করলে যেমন মাটির আম্লিক ভাব বেড়ে যায়, তেমনি সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ব্যবহারে মাটির ক্ষারকীয়তাও বেড়ে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকাটা খুবই জরুরি। তাছাড়াও অজৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে এমন চাষের জমি থেকে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের যৌগমিশ্রিত জল নদী বা পুকুরের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়। মাটির উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে তাই বর্তমানে অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জৈব সার কেন অজৈব সারের চেয়ে ভালো?

- জৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।
- জৈব সার ব্যবহার করলে মাটি রন্ধ্রযুক্ত হয়। ফলে মাটির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান ভালো হয়।
- মাটিতে থাকা উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে জৈব সার।
- জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে।

এবারে তাহলে চট করে অজৈব সার আর জৈব সারে কী পার্থক্য লিখে ফেলার চেষ্টা করো।

বাইরে থেকে সার ব্যবহার না করে মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী কী প্রাকৃতিক উপায়ে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবারে দেখে নেওয়া যাক।

❖ চাষের জমি অনাবাদী ফেলে রাখা

দুটো ফসল চাষের মাঝের সময়টা যদি জমিতে কোনো চাষ না করা যায় তবে প্রাকৃতিক উপায়েই মাটি তার হারানো উপাদানগুলো ফিরে পায়। কারণ এই সময়ে মাঠে জমা হওয়া মৃত উদ্ভিদ, প্রাণী বা অন্যান্য জৈব বস্তু নানারকম জীবাণুর ক্রিয়ায় পচে মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটি তার ফুরিয়ে যাওয়া উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়।

❖ শস্য আবর্তন

মাটি থেকে পাওয়া পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। একই জমিতে ক্রমাগত একই উদ্ভিদের চাষ করে গেলে ওই উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি থেকে ক্রমশ ফুরিয়ে যায়। তাই অনেকসময় দুটো চাষের মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ যেমন মটর, বিন, ছোলা বা ডালের চাষ করা হয়। এই ধরনের উদ্ভিদের মূলে বাসা বাঁধে রাইজোবিয়াম নামে একধরনের মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া। উদ্ভিদেরা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এই ব্যাকটেরিয়া পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগে পরিবর্তিত করে উদ্ভিদদের দেয়। এই নাইট্রোজেনের যৌগগুলো উদ্ভিদদের ব্যবহারের পরে বাকিটা মাটিতে রয়ে যায়। তাই শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের ফসল তোলার পরেও মাটিতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। এর পরে ধান, গম ও ভুট্টা জাতীয় ফসল চাষ করলে এই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগ গ্রহণ করতে পারে। তাই এই ধরনের ফসল একবার চাষ করে, মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করলে মাটি আবার তার হারানো নাইট্রোজেন যৌগ ফিরে পায়। একই ফসল বারবার চাষ না করে মাঝে একবার অন্য ধরনের ফসল (বিশেষতঃ শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ) চাষ করা — এটাই হলো **শস্য আবর্তন**।

মাটির পুষ্টি উপাদানগুলো বজায় রাখার জন্য অনেকসময় মাটিতে নানারকম মিথোজীবী অণুজীব মেশানো হয়। এটাই অণুজীব সার। এই সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। আর মাটিকে রন্ধ্রযুক্ত করে বায়ু চলাচল বাড়ায়।

4. জলসেচ (Irrigation)

প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন জল। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা আর ফুল-ফল-বীজের বিকাশের জন্য জল খুবই প্রয়োজন। তোমরা তো জানো যে উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে জল শোষণ করে। আর জলের সঙ্গেই মাটি থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আর সার।

উদ্ভিদের দেহে প্রায় 90 % জল থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য জল একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়াও জলের সঙ্গে মিশে পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছোয়। ভালো ফসল পেতে গেলে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা খুব জরুরি। মাঠের ফসলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাই জল সরবরাহ করা দরকার। এটাই **জলসেচ**। সাধারণত নদী-হ্রদ, পুকুর, খাল-বিল, জলাধার, কুয়ো, টিউবওয়েল— এইসব উৎসের জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলভেদে এই জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিতেও ফারাক থাকে। তারপরে সেই জল খাল দিয়ে বা পাইপ দিয়ে ইলেকট্রিক বা ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চাষের জমিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনেকসময় ইলেকট্রিক বা ডিজেলের পরিবর্তে সৌরশক্তি বা বায়োগ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই কাজে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সাধারণত মানুষের শ্রম বা পশুশক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতিগুলো তুলনায় সস্তা হলেও কম কার্যকরী হয়। আর জলেরও অপচয় ঘটে।

আধুনিক পদ্ধতি : আধুনিক পদ্ধতিগুলোয় জলের অপচয় কমানো সম্ভব হয়।

চাষের জমিতে ফসলের ওপর ফোয়ারার মতো জল ফেলা হয়।

ফোয়ারা পদ্ধতি (Sprinkler system)

পাইপের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের ঠিক কাছে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ড্রিপ পদ্ধতি (Drip system)

5. আগাছা দমন (Protection from weeds)

অনেকসময় চাষের জমিতে যে ফসলের চাষ করা হচ্ছে, সেটা ছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। এই অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলোই হলো **আগাছা**। এই আগাছাগুলো যে উদ্ভিদের চাষ করা হচ্ছে, তাদের জল, পুষ্টি উপাদান, থাকার জায়গা আর আলোয় ভাগ বসায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কোনো কোনো আগাছা ফসল তোলায় বাধা সৃষ্টি করে। চাষিরা আগাছা নির্মূল করার জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জমিতে বীজ বোনার আগে চাষিরা যখন জমি চষেন তখনই আগাছাগুলো মূলশুদ্ধ উপড়ে আসে। আর তারপর শুকিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়।

চাষিরা অনেকসময় হাতে করে মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলেন। কখনও বা আগাছাগুলোকে মাটির খুব কাছ থেকে কেটে দেন। অনেকসময় আবার কিছু রাসায়নিক (যেমন 2, 4-D, ড্যালাপোন, পিক্লোরাম ইত্যাদি) স্প্রে করেও আগাছা দমন করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোই হলো **আগাছানাশক** (weedicide)। এই রাসায়নিকগুলো ফসলের কোনো ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই স্প্রে করার সময় চাষিদের নাক আর মুখ ঢেকে নেওয়া দরকার।

আগাছা দমনের কথা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো এই ফাঁকে চাষের জমির কয়েকটা সাধারণ আগাছার নাম তোমাদের জানিয়ে রাখি। এরা হলো— পার্থেনিয়াম, অ্যামারান্থাস, চেনোপোডিয়াম, ঘাস ইত্যাদি।

6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো (Protection from pests)

ইঁদুর, বিভিন্ন পোকা (পঙ্গপাল, উই, গুবরে জাতীয় পোকা) ফসল খেয়ে নেয় বা নষ্ট করে। এরাই হলো **ফসল-ধ্বংসকারী প্রাণী** (Pest)। পঙ্গপালরা দল বেঁধে উড়ে আসে আর আখ, গমের মতো উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। কিছু পোকা আছে যারা কাণ্ডটা কুরে কুরে খায়। এরা হল stem borer। আবার উই উদ্ভিদের মূল খায়।

পঙ্গপাল

উই

গুবরে জাতীয় পোকা

এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসও উদ্ভিদে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কিছু ছত্রাক যেমন গমে মরিচা রোগ আর আলুতে ধসা রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া উইলট (Wilt) নামে একটা রোগ সৃষ্টি করে। ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীদের দমনের দুটি উপায় আছে - **রাসায়নিক** (Chemical) ও **জৈবিক** (Biological)।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

ডিডিটি (DDT), বিএইচসি (BHC), ম্যালাথিওন পতঙ্গদের দমনে সাহায্য করে। সালফার আর তামার বিভিন্ন লবণ ছত্রাক দমনে সাহায্য করে। জিঙ্ক ফসফাইড আর ওয়ারফেরিন ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের দমন করে।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক প্রাণীদের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হলেও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- অনেকসময় ক্ষতিকারক প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট একটা রাসায়নিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- আবার অনেকসময় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো নদী বা হ্রদের জলে মিশে দূষণ ছড়ায়।
- রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করলে, খাদ্যশৃঙ্খলের শেষের দিকের জীবদের ক্ষতি হতে পারে।
- রাসায়নিক পদার্থগুলো ফল বা সবজির মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
- রাসায়নিক পদার্থগুলো অনেকসময় উপকারী পতঙ্গদের (মৌমাছি, প্রজাপতি) মেরে ফেলে।

এইসব কারণেই অনেকসময় ফসল ধ্বংসকারী জীবদের দমনে জৈবিক দমন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

জৈবিক দমন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি জীবকে অন্য জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। পরভুক (predator) আর পরজীবীদের (parasites) মাধ্যমে ফসল ধ্বংসকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে কয়েক ধরনের মাকড়সা, বোলতা, ভীমরুল, গঙ্গাফড়িং ও বেশ কিছু ধরনের পাখি, ফসলের শত্রুদের (যেমন মথ, রস- শোষক পোকা, উই, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি) ধরে খায়। তাছাড়াও কিছু ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস ফসলের শত্রুদের দেহে পরজীবী রূপে বাস করে ওইসব জীবদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

7. ফসল তোলা (Harvesting)

ফসল পরিণত হলে ফসল সংগ্রহ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফসল তোলার সময় ফসল বিশেষে কখনও হাত দিয়ে তোলা হয়। আবার কখনও বা মাটির খুব কাছ থেকে কাস্তে দিয়ে কেটে নেওয়া হয়।

কাস্তে

মাড়াই (Threshing)

দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ফসল উদ্ভিদকে (Crop plant) ভোজ্য অংশ থেকে আলাদা করতে হয়। এটাই হলো **মাড়াই**। অনেকসময় ফসল উদ্ভিদকে মাটিতে আছড়েও এই কাজটা করা হয়। কখনও বা মাটিতে ফসল উদ্ভিদটি রেখে তার ওপর দিয়ে গাধা বা ষাঁড়দের হাঁটানো হয়।

ঝাড়াই (Winnowing)

এরপর ঝাড়াই করে দানাশস্য আর ভূষি আলাদা করা হয়। এই কাজে সাহায্য নেওয়া হয় বাতাসের। উঁচু জায়গা থেকে ফেললে, ভূষি হালকা বলে হাওয়ায় উড়ে যায় আর দানাশস্যগুলো মাটিতে এসে পড়ে।

কম্বাইন হারভেস্টার (Combine Harvester) বা কম্বাইন (Combine) নামের মেশিনের সাহায্যে ফসল তোলা, মাড়াই আর ঝাড়াই সবই করা যায়। ফসল তুলে নেওয়ার পর কাণ্ডের যে অংশগুলো চাষের জমিতে রয়ে যায়, সেগুলো আর ভূষি গবাদিপশুদের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়। গবাদিপশুদের এই খাবারই হলো জাব (fodder)।

কম্বাইন

8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা / মজুত করা (Storage)

শস্যাগার

ফসল তোলার পরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফসল মজুত করে রাখা। দীর্ঘ সময় ধরে মজুত করার সময় পোকা, ইঁদুর আর বিভিন্ন অণুজীবদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সদ্য সংগ্রহ করা ফসলে আর্দ্রতা বেশি থাকে। দানা জাতীয় শস্য শুকিয়ে নিয়ে মজুত না করা হলে, তাতে নানা অণুজীবের আক্রমণ ঘটতে পারে। তাই মজুত করার আগে দানা জাতীয় শস্য ভালো করে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। আর্দ্রতা কম থাকলে বিভিন্ন পোকা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

চাষিরা চটের ব্যাগ বা ধাতব পাত্রে দানাজাতীয় শস্য রাখেন। এছাড়াও ব্যাপক মাত্রায় সঞ্চয়ের জন্য শস্যাগার বা বায়ুহীন ঘর (Silo) ব্যবহার করা হয়। উন্নত মানের এইসব শস্যাগার বায়ুহীন, আর্দ্রতাশূন্য হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এখানে ঢুকতে পারে না। এমনকি সারাক্ষণ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থাও থাকে এখানে। অনেকসময় ফসল মজুত করার আগে ফসলের গুদামে আর ফসল মজুত রাখার ব্যাগ বা পাত্রে কীটনাশক আর ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয়।

বর্তমানে শস্যাগারের মধ্যে সারাক্ষণ নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করার ফলে ফসল-ধ্বংসকারী জীবেরা (ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পোকা আর অণুজীব) শস্যাগারের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে বাঁচতে পারে না।

উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

ধান

ধান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ শস্য। ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান।

ভারতের কোথায় কোথায় ধান চাষ হয়

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কম-বেশি ধান চাষ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, আর তামিলনাড়ুতে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ভালো।

❖ **চালের পুষ্টিমূল্য**

ধান থেকে পাওয়া যায় চাল। চালে 79.1% কার্বোহাইড্রেট, 6% প্রোটিন আর 0.4% বিভিন্ন মৌল থাকে। এছাড়াও থাকে ভিটামিন B- কমপ্লেক্স আর অন্যান্য কিছু ভিটামিন। এছাড়াও ধানের ভূষি থেকে তেল পাওয়া যায়।

❖ **ধানের প্রকারভেদ**

জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর চাষ করার পদ্ধতি অনুসারে ধানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এরা হলো **আউশ** বা **শরৎকালীন ধান**, **আমন** বা **শীতকালীন ধান** আর **বোরো** বা **গ্রীষ্মকালীন ধান**।

উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে আবার ধানকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়— অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল দেশি প্রকারের ধান আর উচ্চফলনশীল প্রকারের ধান।

এবারে আউশ, আমন আর বোরো ধানের চাষ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা কথা জেনে নিই।

♦ **আউশ**

আউশ ধান সাধারণত জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। তাই এর চাষের পদ্ধতি, আমন ও বোরো ধান চাষের পদ্ধতির থেকে একটু আলাদা। সাধারণত রবি ফসল তুলে নেওয়ার পরেই জমি তৈরি করে জমিতে ধান বোনা হয়। পলি, দোঁয়াশ বা এঁটেল — প্রায় সব ধরনের মাটিতেই আউশ ধান বোনা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে অবশ্য সরাসরি বীজ না বুনে, বীজতলা তৈরি করেও আউশ ধান বোনা হয়।

♦ **আমন**

যে-কোনো ধরণের মাটিতে বর্ষাকালে আমন ধানের চাষ করা হয়। তবে কাদা মাটি বা এঁটেল মাটিই চাষের জন্য ভালো। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষই বেশি। আমাদের দেশে প্রায় কয়েক হাজার জাতের আমন ধান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার দেশি জাতগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশি আমন ধানের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতগুলো হলো — ভাসামানিক, ঝিঙ্গাশাল, রঘুশাল, পাটনাই - 23, বাসমতী প্রভৃতি। আমন ধান চাষের জন্য আগে বীজতলায় বীজ ফেলে চারাগাছ তৈরি করা হয়। এরপরে চাষের জমিতে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়। বীজতলায় ফেলার আগে বীজগুলো শোধন করে নেওয়া দরকার।

♦ **বোরো**

আমন ধান কাটার পরে বীজতলা তৈরি করে এই ধরনের ধান রোপণ করা হয়। আর মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ ধান কাটা হয়। যেসব অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়।

ধান কত তাড়াতাড়ি পাকে, তার ভিত্তিতে আবার ধানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- জলদি জাত/স্বল্পমেয়াদি জাত — ধান খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। যেমন রত্না জাতের ধান 95-115 দিনের মধ্যে পেকে যায়।
- মাঝারি জাত/মধ্যমেয়াদি জাত — ধান পাকতে মাঝারি রকম সময় লাগে। জয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি জাতের ধান 116-135 দিনের মধ্যে পাকে।
- নাবি জাত বা দীর্ঘমেয়াদি জাত — ধান পাকতে বেশিদিন সময় লাগে। স্বর্ণ, মাসুরি, পঙ্কজ প্রভৃতি ধান পাকতে 140-150 দিন সময় লাগে।

আউশ, আমন, বোরো সবারই জলদি, মাঝারি আর নাবি জাতের ধান আছে। আর একটা কথাও কিন্তু খেয়াল রেখো, একই জাতের ধানকে আউশ, আমন বা বোরো এই তিন মরশুমেই চাষ করা যায়।

নীচের তালিকায় আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষের একটা সাধারণ সময়সূচি দেওয়া হলো।

ধানের প্রকার	বীজতলা তৈরি করা	ধান রোপণ করা	ধান বোনা	ধান কাটা
আউশ	x x x	x x x	উঃবঙ্গ: মার্চ-এপ্রিল দঃবঙ্গ: মে-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর
আমন	জুন-জুলাই	জুলাই-আগস্ট	x x x	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
বোরো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	x x x	এপ্রিল-মে

চা

চা-এর সঙ্গে তোমাদের সবারই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইরাবতী নদীর অববাহিকা চায়ের আদি নিবাস। চিনা ভাষায় Tey থেকে Tea শব্দটা এসেছে বলে মনে করা হয়। চিন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা আর টার্কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলো হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু আর কেরালা। 1000 থেকে 2500 মিটার উঁচু এলাকার পাহাড়ের গায়ে আম্লিক মাটিতে চায়ের চাষ হয়। ভারতে নানা ধরনের চা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দার্জিলিং, আসাম আর নীলগিরির চা বিখ্যাত।

❖ চায়ের গুণাগুণ

- চা পান করলে শরীরে উদ্দীপনা আসে। এর মূলে আছে চায়ে ক্যাফিনের উপস্থিতি।
- চায়ে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, উদ্‌বায়ী তেল আর ভিটামিন B- কমপ্লেক্স — যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
- চায়ে উপস্থিত পলিফেনল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, হেপাটাইটিস সারাতেও সাহায্য করে।
- চায়ের প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ক্যাফিন ও থিয়োফাইলিন স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে আর হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখে।
- চায়ে বেশি পরিমাণে থাকা ফ্লুওরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।
- কালো চায়ে প্রচুর ভিটামিন B-কমপ্লেক্স আর ফলিক অ্যাসিড থাকে। এদের প্রদাহ-প্রতিরোধী আর ক্যানসার-প্রতিরোধী ভূমিকা আছে।
- সবুজ চায়ে থাকে ভিটামিন K যা শরীরের ভেতরে হওয়া রক্তক্ষরণ, রিউম্যাটিক প্রদাহ আর হার্ট অ্যাটাক হতে বাধা দেয়।

❖ চা গাছের প্রকারভেদ

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত চা উৎপাদনকারী তিন ধরনের গাছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন। এরা হলো চিনা জাত, আসামি জাত আর ক্যাম্বোড সংকর জাত। এছাড়াও চা তৈরি করা হয় না অথচ *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত এরকম আরো অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় এমন চা গাছের উৎপত্তিতে এদের সবার ভূমিকা রয়েছে। তাই বাণিজ্যিক চা গাছগুলোকে বিশেষ কোনো জাতের বলে চিহ্নিত করা মুশকিল।

❖ বংশ বিস্তার (Propagation)

বীজ থেকে বা উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে, এই দু-ভাবেই চা গাছের বংশবিস্তার করানো হয়।

♦ **বীজ থেকে**

ভালো জাতের সুস্থ, সবল আর সতেজ বীজ বেছে নেওয়া হয়। এরপর বালির ওপরে (Sand bed) বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলোকে পলিথিনের প্যাকেটে নার্সারি বাগিচায় স্থানান্তরিত করা হয়। নার্সারি বাগিচায় জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাথার ওপর শামিয়ানা খাটিয়ে বা প্যান্ডেল তৈরি করে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 15-18 মাস পরে চারাগাছগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

♦ **অঙ্গজ বিস্তার**

পর্ব থেকে কেটে নেওয়া শাখা অঙ্গজ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। ছায়া নেই এমন জায়গায় জন্মানো আর পাতা তোলা হয় না এমন চা গাছের ঝোপ থেকে শাখা কেটে নেওয়া হয়। সাধারণত সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাজটা করা হয়। সাধারণত 3-4 সেন্টিমিটার লম্বা শাখা কাটা হয় যাতে একটা পাতা আর একটা ফোলা সুপ্ত কাক্ষিক মুকুল আছে। এই কেটে নেওয়া শাখাগুলোকে এরপর নার্সারি বাগিচা আর তারপর পলিথিনের প্যাকেটে স্থানান্তরিত করা হয়। শামিয়ানা বা প্যান্ডেল খাটিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত 12-18 মাস বয়সের চারাগাছ চাষের জমিতে লাগানো হয়।

প্রাণীজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

আমরা উদ্ভিদ থেকে যেমন নানা ধরনের খাবার পাই, তেমনই প্রাণীদের থেকেও পাই। তোমরা এর আগে দেখেছ যে উদ্ভিদজাত খাবার পেতে গেলে চাষ করতে হয়। একইভাবে প্রাণীজাত খাবার নিয়মিত আর যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলেও সেইসব প্রাণীদের যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করা দরকার। আর সেইসঙ্গে দরকার তাদের প্রজননের সুব্যবস্থা করা। এটাই হলো **পশুপালন (Animal husbandry)**।

মাছ

মাছ চাষ (Fisheries), কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাছ ছাড়াও চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীদের চাষও মাছ চাষের মধ্যেই পড়ে। আমরা কেবল মাছের চাষ (Pisciculture) নিয়েই আলোচনা করব।

❖ **মাছ চাষের প্রকারভেদ**

মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মাছ চাষকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী)

সংগ্রহভিত্তিক (Capture)	**পালনভিত্তিক** (Culture)
নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়ে মাছ পালন করা সম্ভব হয় না। তাই নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়গুলোতে কেবল মাছ ধরা হয়।	পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, ভেড়ি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ,খাদ্য সরবরাহ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী মাছ চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী)

- **অন্তর্দেশীয়** (Inland)
  - **স্বাদু/মিঠেজল** (Fresh water)
  - **অল্প লবণাক্ত জল** (Brackish water)
- **সামুদ্রিক** (Marine)
  - **উপকূলীয়** (Coastal)
  - **গভীর সামুদ্রিক** (Deep Sea)

আমরা এখানে মূলত স্বাদু জলে পালনভিত্তিক মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণত যেসব মাছের চাষ করা হয় তাদের সম্বন্ধে জেনে নিই।

❖ **কার্প কী?**

মিঠে জলে বাস করা যেসব অস্থিযুক্ত মাছের ত্রিকোণাকৃতি মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও চোয়ালে দাঁত অনুপস্থিত আর দেহের ভেতরে পটকা থাকে— তারাই হলো **কার্প**। যেমন রুই, কাতলা, বাটা ইত্যাদি মাছ। কার্পকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

কার্প

দেশি কার্প (Indigenous carp)

মেজর কার্প

- আকারে বড়ো।
- তাড়াতাড়ি বাড়ে। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না।
- ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর চাহিদাও বেশি।

উদাহরণ: রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস

মাইনর কার্প

- আকারে ছোটো।
- তাড়াতাড়ি বাড়ে না। সাধাবণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে।
- ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উদাহরণ: বাটা, পুঁটি ইত্যাদি

বহিরাগত কার্প (Exotic carp)

- বিদেশ থেকে আমদানি করা।
- ভারতীয় জলবায়ুতে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে আর প্রজননেও সক্ষম।

উদাহরণ: গ্রাস কার্প/ঘেসো রুই, কমন কার্প/আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প

রুই

কাতলা

মৃগেল

কালবোস

পুঁটি

কমন কার্প

সিলভার কার্প

গ্রাস কার্প

❖ **মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়**

1. ডিম পোনা সংগ্রহ

প্রজনন ঋতুতে অর্থাৎ জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে রুই, কাতলা, মৃগেলের স্ত্রী মাছগুলো অগভীর জলে ডিম ছাড়ে আর পুরুষ মাছ তার শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়। আর মাছ চাষিরা জাল দিয়ে ছেঁকে ডিম পোনা আর নিষিক্ত ডিমগুলোকে হাঁড়িতে সংগ্রহ করে। নিষিক্ত ডিম কোনগুলো জানো? যেসব ডিমের সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন হয়েছে, সেগুলোই হলো নিষিক্ত ডিম। আর এই মিলনের প্রক্রিয়াটাই হলো **নিষেক**। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকেই ডিম পোনা তৈরি হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতি

- কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিমপোনা তৈরি করলে কোন কোন মাছের ডিমপোনা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর ডিমপোনা সংগ্রহেও অনেক সুবিধা হয়।
- এই পদ্ধতিতে প্রতিটা সুস্থ, সবল স্ত্রী মাছের জন্য দুটো সুস্থ, সবল পুরুষ মাছ নেওয়া হয়। মাছের মাথায় মানুষের মতোই একটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে— এর নাম পিটুইটারি গ্রন্থি। মাছের পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস নিয়ে ওই বাছাই করা মাছদের ইনজেকশান দেওয়া হয়। আর পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কোনটাকে কখন কতবার কতটা ইনজেকশান দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তোমরা পরে এবিষয়ে বিশদে জানবে।
- পিটুইট্যারি ইনজেকশান দেওয়ার ফলে স্ত্রী মাছ ডিম আর পুরুষ মাছ শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়।

2. ডিম পোনা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছ

প্রকৃতি থেকে মাছ চাষীদের সংগ্রহ করা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে ডিম পোনা তৈরি করার জন্য একটা পুকুরে রাখা হয়। এটাই **হ্যাচারি**। আর ডিম পোনাদের পরপর বেশ কয়েকটা পুকুরে প্রতিপালন করে পূর্ণাঙ্গ মাছ তৈরি করা হয়। এই পুকুরগুলো হলো আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর আর সঞ্চয়ী পুকুর।

ডিম পোনা —(আঁতুড় পুকুর)→ ধানি পোনা —(পালন পুকুর)→ চারা পোনা —(সঞ্চয়ী পুকুর)→ পূর্ণাঙ্গ মাছ

❖ মিশ্র মাছ চাষ

দেশি মাছদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল—এরা পুকুরের জলের বিভিন্ন স্তরে বাস করে আর সেখান থেকেই খাবার সংগ্রহ করে। যেমন কাতলা মাছ ও সিলভার কার্প জলের ওপরের স্তর থেকে, রুই মাছ ও গ্রাস কার্প জলের মাঝের স্তর থেকে আর মৃগেল মাছ ও কমন কার্প জলের নীচের স্তর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। তাই এই ধরনের মাছগুলো একসঙ্গে চাষ করলে খাবার ও থাকার জায়গা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। ফলে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় একই পুকুরে কেবল রুই, কাতলা আর মৃগেল মাছের চাষ করা হয়। আবার অনেক সময়ে দেশি আর বহিরাগত এই দু রকম মাছের চাষ একই পুকুরে করা হয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাছের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে গেছে। তিন ধরনের দেশি মাছ একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো **মিশ্র মাছ চাষ**। আর তিনধরনের দেশি কার্পের সঙ্গে তিনধরনের বহিরাগত কার্প একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো **নিবিড় মিশ্র চাষ** বা **পলিকালচার**।

❖ ময়লা জলে মাছ চাষ

আগে জানা দরকার ময়লা জল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। ঘরবাড়ি, পৌরসভা ও কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ মেশানো সাধারণত কালো রঙের জল — একেই বলা হয় ময়লা জল। এই জলে মল-মূত্রও মিশে থাকে। আর থাকে কঠিন পদার্থরূপে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ।

ময়লা জলে থাকা বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, অজৈব সারের মতো কাজ করে। ফলে জলে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই মাছের প্রাথমিক খাবার, ফাইটোপ্ল্যাংকটন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। আর এরই ফলে তৈরি হয় জুপ্ল্যাংকটন ও অন্যান্য পোকামাকড়ও। এরাও মাছের খাবার। তাই বাইরে থেকে কৃত্রিম খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি অপরিশোধিত ময়লা জল ব্যবহার করলে মাছের ক্ষতি হয়। তাই মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি ব্যবহারের আগে ময়লা জল পরিশোধন করে নেওয়া জরুরি।

পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলো এই ময়লা জলে মাছ চাষের অন্যতম কেন্দ্র। বিভিন্ন ক্যানাল বা নালার সাহায্যে কলকাতার ময়লা জল নিয়ে ওই অঞ্চলের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করা হয়। তারপর ওই জলে মাছ চাষ করা হয়।

মাছের পুষ্টিগুণ

প্রাণিজ প্রোটিন, অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহে মাছের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Ca, P, Na, K, Mg, S) ও কিছু ভিটামিন (A, C, D ও B-কমপ্লেক্স) থাকে।

পোলট্রি

হাঁস আর মুরগীর মতো পাখিদের পালন করা হয় আর্থিক লাভের জন্য। কারণ এদের ডিম আর মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন পাখিরাই হলো পোলট্রি পাখি। আমরা এখানে কেবল মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব। অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগিদের তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়।

মুরগি (অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে)

ডিম উৎপাদনকারী জাত
(Laying breed)

এরা বছরে 150-200 বা তারও বেশি ডিম পাড়ে। তাই ডিমের জন্যই এদের পালন করা হয়।
উদাহরণ: লেগহর্ন, মিনরকা

মাংস উৎপাদনকারী জাত
(Table breed)

এরা বছরে অধিক পরিমাণে মাংস উৎপন্ন করে। তাই শুধু মাংসের জন্য এদের পালন করা হয়।
উদাহরণ: আসিল,চিটাগং, ব্রামা, কোচিন

উভগুণ সম্পন্ন জাত
(Dual breed)

এই ধরনের মুরগিদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিম আর মাংস পাওয়া যায়। ডিম আর মাংস দুটোই পাওয়ার জন্য এদের পালন করা হয়।
উদাহরণ: রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার

মুরগি পালনের আধুনিক পদ্ধতি

ব্যাটারী খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি

- বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনের জন্য ছোটো ছোটো খাঁচার মতো জায়গায় মুরগি রাখা হয় যেখানে তারা বসতে বা দাঁড়াতে পারে।
- সারিবদ্ধ খাঁচার বাইরে খাবার আর জলের পাত্র থাকে।
- খাঁচার মেঝে ঢালু থাকায় ডিম পাড়লে সেটি গড়িয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা খাঁজে জমা হয়।

ডিপ-লিটার পদ্ধতি

- পরিষ্কার শুকনো মেঝে জীবাণুমুক্ত করে বিচালির টুকরো, শুকনো পাতা, ধান, তুলোবীজ, যবের তুষ, ভুট্টা, আমের খোসা ইত্যাদি দিয়ে ঘরের মেঝেতে শয্যা তৈরি করা হয়। এটাই **লিটার**। এর ওপর মুরগিরা থাকতে শুরু করে।
- ডিপ-লিটার ঘরের দেয়ালে আবার ডিম পাড়ার জন্য বাসা বসানো থাকে। মুরগিরা ওই বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে।

ব্রয়লার মুরগি হলো একধরনের সংকর মুরগি। শুধু মাংস পাওয়ার জন্য এদের পালন করা হয়।

মুরগির মাংস ও ডিমের পুষ্টিগুণ

মুরগির মাংস আর ডিম প্রাণীজ প্রোটিনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুরগির মাংসে ক্ষতিকারক ফ্যাটের পরিমাণ অন্যান্য মাংসের তুলনায় কম থাকায় এটি স্বাস্থ্যকর। মুরগির ডিম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের জোগান দেয়। ডিম বিভিন্ন মৌলের ((Fe, Ca, P, K) ও ভিটামিনের (A, B-কমপ্লেক্স, D ও E) চাহিদা মেটায়।

মনে রাখা জরুরি :

- বিজ্ঞানের যে শাখায় খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলে কৃষিবিজ্ঞান।
- একই ধরনের উদ্ভিদ যখন অনেকটা জায়গা জুড়ে চাষ করা হয় তখন ওই উদ্ভিদদের একসঙ্গে বলা হয় শস্য বা ফসল।
- ঋতু অনুযায়ী ফসলকে দুভাগে ভাগ করা যায় — খারিফ ফসল ও রবি ফসল।
- অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করা ভালো।
- জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর চাষ করার পদ্ধতি অনুসারে ধানকে তিনভাগে ভাগ করা যায় — আউশ বা শরৎকালীন ধান, আমন বা শীতকালীন ধান আর বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান।
- চায়ে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, উদবায়ী তেল আর ভিটামিন B- কমপ্লেক্স — যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
- মিঠে জলে বাস করা যেসব অস্থিযুক্ত মাছের ত্রিকোণাকৃতি মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও চোয়ালে দাঁত অনুপস্থিত আর দেহের ভেতরে পটকা থাকে — তারাই হলো কার্প।
- মুরগি পালনের আধুনিক দুটি পদ্ধতি হলো — ব্যাটারী খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি ও ডিপ-লিটার পদ্ধতি।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

আমন ধান চাষের জন্য _____ মাটিই উপযুক্ত।

২. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

২.১ অজৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

২.২ সবুজ চায়ে ভিটামিন K থাকে।

৩. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

দেশি আমন ধানের একটি উৎকৃষ্ট জাতের নাম লেখো।

৪. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ চাষের সময় মাটিতে সার ব্যবহার করা হয় কেন?

৪.২ দুটি ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীর নাম লেখো।

৫. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

কৃত্রিমভাবে মাছের ডিম পোনা তৈরির পদ্ধতিটি লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ একটি ব্যবচ্ছেদিত জবা ফুলের বিভিন্ন অংশ ভালোভাবে দেখার জন্য তুমি যা ব্যবহার করবে তা হলো — (ক) সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (খ) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (গ) ম্যাগনিফাইং গ্লাস (ঘ) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

১.২ যে কোশীয় অঙ্গাণু প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে সেটি হলো — (ক) গলজি বস্তু (খ) সাইটোপ্লাজম (গ) লাইসোজোম (ঘ) রাইবোজোম।

১.৩ খারিফ ফসলের একটি উদাহরণ হলো — (ক) গম (খ) ভুট্টা (গ) ছোলা (ঘ) সরষে।

১.৪ মারকিউরাস ক্লোরাইডের সংকেত হলো— (ক) HgCl (খ) $HgCl_2$ (গ) Hg_2Cl_2 (ঘ) Hg_2Cl

১.৫ একাধিক রকমের ক্যাটায়ন দেয় যে ধাতুটি সেটি হলো— (ক) Na (খ) Ca (গ) Mg (ঘ) Sn

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ পিতামাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য _____ মাধ্যমে বাহিত হয়।

২.২ প্রত্যেকটি কলা আসলে একইরকম কাজ করতে পারে এমন _____ সমষ্টি।

২.৩ _____ গ্যাস উদ্ভিদ বাতাস থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।

২.৪ আইসোবারদের ভরে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তাদের _____ সমান।

২.৫ ফেরাস আয়ন অপেক্ষা ফেরিক আয়নের চার্জের পরিমাণ _____।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার বাইরের দিক মসৃণ বা অমসৃণ হওয়া নির্ভর করে রাইবোজোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর।

৩.২ কোশের পর্দাবিহীন অঙ্গাণু হলো ভ্যাকুওল।

৩.৩ অপরিশোধিত ময়লা জল সরাসরি মাছ চাষে ব্যবহার করা হয়।

৩.৪ পশ্চিমবঙ্গের শীতকালীন ধান হলো আউশ।

৩.৫ ডিমোক্রিটাস পরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

৩.৬ কঠিন অবস্থায় অণু-পরমাণুরা কাছাকাছি থাকলেও তাদের মধ্যে কিছুটা ফাঁকও থাকে।

৩.৭ আয়নিক যৌগের কেলাসে মূলত বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদের মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণই তাদের একত্রে ধরে রাখে।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাচের লেন্সের পরিবর্তে কী ব্যবহার করা হয়?

৪.২ একটি পর্দাবিহীন কোশ অঙ্গাণুর নাম উল্লেখ করো।

৪.৩ একটি কোশে যদি সব রাইবোজোম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কোশটির কোন কাজ ব্যাহত হবে?

৪.৪ সূর্যের পদার্থের অবস্থাকে কী বলা হয়?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্স দুটির নাম কী কী?

৫.২ কোশপর্দার দুটি কাজ উল্লেখ করো।

৫.৩ মুরগি পালনে 'লিটার' কীভাবে প্রস্তুত করা হয়?

৫.৪ মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের দুটো পার্থক্য উল্লেখ করো।

৫.৫ কঠিনের নিজস্ব আকৃতি ও আয়তন আছে; গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি বা আয়তন কিছুই নেই। এই পর্যবেক্ষণ থেকে কঠিন অবস্থা আর গ্যাসীয় অবস্থা এই দুইয়ের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে অণু-পরমাণুদের মধ্যে আকর্ষণ বল প্রবলতর বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দাও।

৫.৬ কঠিন অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের কেলাসে সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন থাকলেও কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎপরিবাহিতা নগণ্য হয় কেন?

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ নিউক্লিয়াসের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি অংশ চিহ্নিত করো :

(ক) ক্রোমাটিন জালিকা (খ) নিউক্লিওলাস।

দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য

সংক্ষেপে নিউক্লিয়াসের গঠন লেখো।

৬.২ 'বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহারের কথা বলা হয়।' এর কারণ কী?

৬.৩ একই জমিতে দুবার চাষের মাঝে ডাল জাতীয় উদ্ভিদ চাষ করা হয় কেন?

৬.৪ ''কোনো পরমাণুর ভর হল প্রায় তার নিউক্লিয়াসের ভর'' — যুক্তিসহ সমর্থন করো।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ইতিহাস

অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদন ও বিন্যাস

মহঃ মাসুদ আখতার

বিষয় নির্মাণ

অর্পিতা ভাদুড়ি
সঞ্চিতা বর্মণ

ড. তন্ময় কুমার ঘোষ
সমরেন্দ্রনাথ সিনহা

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইতিহাসের উপাদান	১-৫
২.	খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক	৬-৭
৩.	প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চা	৮-১১
৪.	অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা	১২-১৫
৫.	প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার ইতিহাস : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক	১৬-২০
৬.	ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ	২১-২৪
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ১	২৫-২৬
৭.	দিল্লি সুলতানি	২৭-৩০
৮.	দিল্লি সুলতানির অর্থনীতি	৩১-৩৪
৯.	বিজয়নগর সাম্রাজ্য	৩৫-৩৮
১০.	নতুন ধর্মীয় ভাবনা : ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ	৩৯-৪৩
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ২	৪৪-৪৫
১১.	মুঘল সাম্রাজ্য	৪৬-৪৯
১২.	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	৫০-৫৩
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩	৫৪-৫৫
	পঠন সেতুর বিষয় প্রসঙ্গে	৫৬

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

ইতিহাসের উপাদান

১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলির তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্য উপাদান কীভাবে ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে, তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পুরোনো দিনের কথা গুছিয়ে লেখা থাকলে সহজেই জানা যেত পুরোনো সময়ের কথা। কিন্তু, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা ছিল না। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা নানাভাবে সেই ইতিহাস জানার চেষ্টাই করেন। হরেক উপাদানের টুকরো জুড়ে জুড়ে একটা গোটা ছবি তৈরি করেন। তবুও সবসময় ছবিগুলো পুরোপুরি তৈরি হয় না। কারণ উপাদানে ফাঁক থেকে যায়। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মূল ছ-টি ভাগে ভাগ করা যায়। তার প্রতিটির মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে। নীচের তালিকা-চাকাটি খেয়াল করো।

প্রত্নবস্তু :

কখনও ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরের চিহ্ন। কখনও বা নানা পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি। আবার মাটির পাত্রের গায়ে লেগে থাকা শস্যের দানা বা খোসা। কখনও মানুষ ও পশুর হাড়গোড়, কঙ্কাল। এগুলিই প্রত্নবস্তু। এগুলিই হলো প্রত্নবস্তু। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে প্রত্নবস্তুগুলির গুরুত্ব বিরাট।

লেখ :

প্রত্নবস্তুর পরেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লেখমালা। প্রাচীনকালে পাথর বা ধাতুর পাতে লিপি খোদাই করে লেখা হতো। সেই লেখাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। পাথরের গায়ে খোদাই লেখাগুলিকে শিলা (পাথর) লেখ বলা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখগুলি লেখমালার শ্রেষ্ঠ নমুনা। আবার অনেক শাসকের গুণগানও লেখ হিসাবে খোদাই করা হতো। সেগুলোকে বলে প্রশস্তি।

মুদ্রা :

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য মুদ্রা কাজে লাগে। মুদ্রায় শাসকের নাম, মূর্তি প্রভৃতি খোদাই করা থাকে। অব্দও পাওয়া যায় মুদ্রায়। এর ফলে মুদ্রা থেকে নানারকম তথ্য জানতে পারা যায়। শক-কুষাণদের ইতিহাস তো তাদের মুদ্রা থেকেই জানা যায়।

শিল্পবস্তু :

প্রাচীন ভারতের নানা শিল্পবস্তু থেকেও ইতিহাসের নানা কিছু জানা যায়। এই শিল্পবস্তু সাধারণভাবে তিনরকমের। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা।

দেশীয় সাহিত্য :

লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোটা অনুমান করতে হয় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম সাহিত্য উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলোকে মোটামুটি দু-রকম ভাগ করা যায়। দেশি ও বিদেশি লেখকদের রচনা। দেশীয় সাহিত্যকে আবার ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যে ভাগ করা যায়। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হলো বৈদিক সাহিত্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে মহাকাব্য ও পুরাণগুলির গুরুত্ব আছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের নানা লেখাতেও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নানা বই থেকেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। রাজনীতি, ব্যাকরণ, বিজ্ঞানের বইতেও সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির নানা কথা রয়েছে। পাশাপাশি কাব্য, নাটক, অভিধান, চিকিৎসাবিষয়ক বইতেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। বেশ কিছু জীবনীমূলক লেখাপত্রও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। বাণভট্টের হর্ষচরিত এমন লেখার একটি প্রধান উদাহরণ।

বিদেশী বিবরণ :

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য তিনধরনের বিদেশি বিবরণ খুব জরুরি। গ্রিক, রোমান ও চিনা দূত ও পর্যটকদের বিবরণ। তবে, বিদেশি সাহিত্যগুলির কয়েকটি সমস্যা আছে। বিদেশিরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি বুঝতেন না। ফলে অনেক কিছুর মানে বুঝতে তাদের ভুল হয়েছিল। তাছাড়া অনেক লেখার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা দেখেছো বিভিন্ন শাসকের আমলে তাদের রাজকবি, লেখক, ঐতিহাসিক, বিদেশী ভ্রমণকারী বা স্বয়ং শাসকের লেখা থেকে সমকালীন বা অন্যান্য নানা তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন শাসকের রাজত্বকালে প্রবর্তিত মুদ্রাও ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে।

চিনা বৌদ্ধ পর্যটক সুয়ান জাং বাংলার প্রাচীন নগর কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। সুয়ান জাং লিখেছেন যে, এই দেশটি জনবহুল এবং এখানকার মানুষেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এছাড়া তিনি থানেশ্বর, কনৌজ ও বারাণসীতে ব্যবসায়িক কাজকর্মের রমরমার উল্লেখ করেছেন।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ রামপালের ছেলে মদনপালের শাসনকালে রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন। রামচরিতের কাহিনি রামায়ণের গল্প অনুসারে লেখা হয়েছে। এতে কবি একই কথার দু-রকম মানে করেছেন। তিনি একদিকে রামায়ণের রাম এবং অন্যদিকে পালরাজা রামপালের কথা লিখেছেন।

লক্ষণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর গীতগোবিন্দম কাব্যের বিষয় ছিলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনি। লক্ষণসেনের রাজ্যসভার আর এক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন পবনদূত কাব্য। এযুগের আরও তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। বল্লালসেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বই দুটি পাওয়া গেছে।

ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। বতুতা লিখেছেন— ‘‘ভারতে ডাকে চিঠিপত্র পাঠাবার দু-রকম ব্যবস্থা আছে। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে ‘উলাক’ বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি চারমাইল অন্তর ডাকের ঘোড়া রাখা হয়। পায়ে হেঁটে যে-ডাকের ব্যবস্থা আছে তাকে বলা হয় ‘দাওআ’।’’ পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ কৃষ্ণদেব রায়ের সময় বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। পেজের লেখায় বিজয়নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তেলেগু ভাষায় লেখা আমুক্তমাল্যদ গ্রন্থে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।

বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত-এ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে একটি নির্দেশ দেন। তাতে বলা হয়, চৈতন্যদেব সবাইকে নিয়ে কীর্তন করুন অথবা চাইলে তিনি একাকী থাকুন। তাঁকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তা যে কাজি হোক বা কোতোয়াল, তার প্রাণদণ্ড হবে।

আবুল ফজল ও বদাউনির লেখা থেকে মুঘল যুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তবে উভয়ের লেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা।

xyîœ š‹œ ç xyî”œ „y!”î î”yv!˜

xy„îöîî xy›öœî ~„ !î…Äy“ ú!“£y!¢„ !Šöœ˜ xyîœ š‹œ xyÍy!› S1551–1602 !…ƒVÐ “yî öœ…y xy„îî˜y›yë !“!˜ xy„îöîî ²Ÿ‚¢y£ „öîöŠ˜Ð !„sö ë ö„yö˜y ¢›öëî £!“£y¢ ‹y˜ö“ £öœ Ÿ• ¦yöœy „íy ‹y˜öœ£ £ë ˜yÐ ö¢ ëö†î ¢›¢Äyî „íyç ‹y˜ö“ £ëÐ ~£ •îö˜î ¢›yöœy‰˜y ™yçëy ëyë ö¢ ëö†î xyî ~„‹˜ ú!“£y!¢„ xyî”œ „y!”î î”yv!˜î S1540–1615 !…ƒV ›sy…yî–ö vê “çëy!î… î£ö“Ð ~îy ”‹ö˜£ ›‡œ ”îîyöî ~ö¢!Šöœ˜ 1574 !…Ýyö · Ð !„sö xyîœ š‹œ £öë vöà!Šöœ˜ xy„îöîî !²ë ™yeÐ ~„£ ‡Ýy˜yî ”ö•îö˜î !îîî’ ™yçëy ëyë ~ö”î ”‹ö˜î öœ…yëÐ

অবশ্য এই লেখাগুলি সবসময় নির্ভুল তথ্য দিতে পারে না। অনেকসময় ব্যাখ্যার মধ্যে অতিরঞ্জন চোখে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে আবার শাসকের প্রতি পক্ষপাতিত্বও দেখা যায়।

সুয়ান জাং-এর ভ্রমণ বিবরণীতে শশাঙ্ককে ‘বৌদ্ধ বিদ্বেষী’ বলা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিত-এ শশাঙ্ককে নিন্দা করা হয়েছে। অন্যদিকে শশাঙ্কের মৃতুর পঞ্চাশ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ও সিঙ্-এর নজরে পড়েছিল বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি।

মুদ্রা থেকেও ইতিহাস জানা যায়। মুদ্রার গঠন, উপাদান, নকশা, প্রাপ্তিস্থান থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শশাঙ্কের আমলে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার মান পড়ে গিয়েছিল। নকল সোনার মুদ্রাও দেখা যেত। রুপোর মুদ্রা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যুগে সম্ভবত মন্দা দেখা দিয়েছিল।

শশাঙ্কের মুদ্রা

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির একটি সোনার মুদ্রার দুটি পিঠ ।

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর একটি মুদ্রার দুটি পিঠ।

জাহাঙ্গিরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ ।

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম অধ্যায় ইতিহাসের ধারণা পড়ার সময় ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে। যেখানে তোমরা আত্মজীবনী, ফোটোগ্রাফ, মানচিত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র কীভাবে ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে তা শিখবে।

মনে রাখা জরুরি :

- ইতিহাস লেখার জন্য উপাদানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সবচেয়ে জরুরি।
- প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে আছে লেখ, শিল্পবস্তু, মুদ্রা।
- সাহিত্য উপাদান আবার দুরকম — দেশীয় সাহিত্য ও বিদেশী বিবরণ।
- সুলতানি ও মুঘল যুগে বিভিন্ন লেখা, শিল্পবস্তু ও মুদ্রা থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূণ্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হর্ষচরিত রচনা করেন _____ ।

(খ) শাসকের গুণগান খোদাই করা লেখকে _____ বলে।

(গ) আকবরনামা লিখেছিলেন _____।

(ঘ) আমুক্তমাল্যদ রচনা করেন _____ ।

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ লেখেন বদাউনি।

(খ) দানসাগর বইটি লেখেন লক্ষণ সেন।

(গ) সুয়ান জাং শশাঙ্ককে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলেছেন।

(ঘ) পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ কৃষ্ণদেব রায়ের সময় বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন।

৩. সংক্ষেপে লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) রামচরিত কাব্য থেকে কী জানা যায়?

(খ) আবুল ফজল ও বদাউনির লেখা কীভাবে মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে?

খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক

২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মানুষ কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষ কীভাবে যাযাবর থেকে স্থায়ী জীবনে পৌঁছেছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রাচীনকালে মানুষ বনের ফলমূল আহরণ করে ও পশু শিকার করেই খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতো। পৃথিবীর জলমগ্ন থেকেই মানুষ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য জিনিস তৈরি করতে শিখেছে।

আদিম মানুষ প্রথম খাদ্য উৎপাদন শুরু করে নতুন পাথরের যুগে। তখন শুধু খাবার খোঁজা নয়, খাবার তৈরি করতে পারল, তারা।

শিকার করতে বা পশু চরাতে ছেলেরা দল বেঁধে যেত। মেয়েরা বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। ফলমূল জোগাড় করত।

পুরোনো দিনের মানুষেরা একসময় দেখলো, বীজ থেকে নতুন চারা গজাচ্ছে। তখন তাদের মনে নতুন চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। তারা ভাবল, গাছ লাগিয়ে যত্ন করে বড় করলে তা থেকে খাওয়ার শস্য পাওয়া যাবে।

কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে কৃষি অঞ্চলেই স্থায়ী বসতি বানিয়ে থাকতে শুরু করে মানুষ। চাষের সঙ্গে শুরু হয় বাস বা থাকা।

শিকার ও পশুপালনের জন্য মানুষকে নানান জায়গা ঘুরে বেড়াতে হতো। কৃষিকাজ শুরু করার পরে সেই ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়।

কৃষিকাজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। ফলে যাযাবর মানুষ ধীরে ধীরে কৃষির ওপর নির্ভর করে স্থায়ীভাবে জীবনযাপন শুরু করে।

কৃষিকাজের সূচনা হওয়ার পর থেকে সহজেই খাবার শস্য পাওয়া গেল। তারপর মানুষ বুঝতে পারল ভালো করে মাটি খুঁড়ে চাষ করলে আরো বেশি শস্য উৎপাদন করা যাবে। তারপর শুরু হল কাঠের লাঙলের ব্যবহার। প্রথমদিকে মানুষই কিন্তু লাঙল চেপে ধরতো, অন্য একজন টানতো। তারপর এক সময় মানুষ বুঝলো যে গোরু, মহিষ, ঘোড়াদের দিয়ে এই কাজটা আরো ভালভাবে করা যাবে। তাদের ব্যবহার করে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে অনেকটাই বাড়লো।

মানুষ যবে থেকে কৃষিকাজ শুরু করেছিল, তবে থেকেই সে স্থায়ীভাবে একজায়গায় বসবাসের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিল। অনুকূল ভূ-প্রকৃতি, উর্বর মাটি ও জলের উৎসের ওপর নির্ভর করে ছোট ছোট বসতি গড়ে ওঠে। এই ছোট ছোট বসতিই জন্ম দেয় গ্রাম ও পরবর্তীতে শহরের। গ্রাম ও শহরের সমাজবদ্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে একত্রে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবেই শুরু হয় মানব সভ্যতার এগিয়ে চলার ইতিহাস।

মনে রাখা জরুরি :

- পুরোনো দিনের মানুষেরা বনের ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার করত।
- নতুন পাথরের যুগে মানুষ প্রথম খাদ্য উৎপাদন শুরু করে।
- কৃষিকাজ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করে।
- কৃষির ওপর নির্ভর করে মানুষ স্থায়ী জীবযাপন শুরু করে।

নমুনা প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) মানুষ কোন সময় প্রথম খাদ্য উৎপাদন শুরু করে?

(খ) মানুষ কীভাবে খাদ্য উৎপাদন শুরু করেছিল?

(গ) মানুষ কীভাবে খাদ্যের উৎপাদনকে নিশ্চিত করেছিল?

২. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্য) :

(ক) মানুষ কীভাবে যাযাবর থেকে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করেছিল?

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চা

৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার নানাদিক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নানাদিক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সভ্যতার বিভিন্ন সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

মানুষ সবসময়ই উন্নততর জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ক্ষুধা মেটানোর জন্য কৃষিকাজ শুরু করেছে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকাতেই মানুষ খুশী ছিল না। নানা কিছু তৈরী করে চারপাশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করল তারা। গুছিয়ে ভালো ভাষায় নিজের ও অন্যের কথা লিখল। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যের শুরু হল। তাদের অনুসন্ধিৎসু মন আরো কিছু জানার চেষ্টা করল। সেইসব জানার আকাঙ্খা থেকে শুরু হল বিজ্ঞানচর্চার। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশেও সেভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা শুরু হলো। এখানে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষা :

হরপ্পা সভ্যতার লিপি আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এই লিপি পাঠদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। বৈদিক যুগে মুখে মুখে পড়াশোনা চলত। বেদ ছিল প্রধান গ্রন্থ। বেদের অপর নাম শ্রুতি- কারণ বেদ শুনে শুনে মুখস্থ রাখতে হত। পরবর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল। তবে তার পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলিতে এক নতুন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি শুরু হয়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের লিপির ব্যবহার শুরু হয়। বিভিন্ন উপায়ে পড়ার ব্যবস্থা ছিল—

(১) বৈদিক শিক্ষা — ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। একে গুরুকুল ব্যবস্থা বলা হতো।

(২) বৌদ্ধ শিক্ষা — বিভিন্ন বিহার বা সংঘে সমবেতভাবে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করতো।

(৩) আশ্রম শিক্ষাকেন্দ্র — ছাত্ররা সমবেতভাবে আবাসিক আশ্রমেও শিক্ষা গ্রহণ করতো।

শিক্ষার বিষয় :

উপরোক্ত বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ানো হতো। যেমন — কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ণ। এই বিষয়গুলি মূলত ব্রাহ্মণরাই চর্চা করতেন। ক্ষত্রিয়দের জন্য রাজ্যশাসন চালানোর শিক্ষা দেওয়া হত। বৈশ্য ও শুদ্রদের ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হত। কারিগরি শিক্ষাদানও দেওয়া হত। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শ্রমন ও ভিক্ষুকদের সূতাকাটা, কাপড়বোনা শিখতে হত।

ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়কালে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিদ্যালয় ও বৌদ্ধ বিহার স্থাপন হতে লাগলো। ও শিক্ষার বিস্তার ঘটে। কিছু কিছু বৌদ্ধবিহারকে মহাবিহার বলা হতো। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারগুলি বিখ্যাত ছিল। দেশের ও দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন ছাত্র ঐ মহাবিহারগুলিতে পড়তে আসতো, সেখানে থাকা, খাওয়া ও পড়ার জন্য, কোন খরচ লাগতো না। রাজারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র, কনৌজ, মিথিলা, তাঞ্জোর প্রভৃতি নগরে। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অনেকটা আজকের দিনের মতো 'হাতে খড়ির' অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল।

সাহিত্যচর্চা :

এই সময়ে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি এই তিন ভাষার প্রচলন ছিল। এই তিন ভাষাতেই বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জৈন সাহিত্যগুলি প্রাকৃত ভাষায় ও বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি পালি ভাষায় লিখিত হতো। এই সময়কালের বিভিন্ন গ্রন্থ ও লেখকদের নাম —

লেখক		তাঁদের লেখা বই	লেখক		তাঁদের লেখা বই
পাণিনি	—	অষ্টাধ্যায়ী	শূদ্রক	—	মৃচ্ছকটিকম
কৌটিল্য	—	অর্থশাস্ত্র	বিশাখদত্ত	—	মুদ্রারাক্ষম, দেবীচন্দ্রগুপ্তম
বাল্মীকি	—	রামায়ণ	অমরসিংহ	—	অমরকোষ
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	—	মহাভারত	বিষ্ণুশর্মা	—	পঞ্চতন্ত্র
পতঞ্জলি	—	মহাভাষ্য	কালিদাস	—	মেঘদূতম, অভিজ্ঞান শকুন্তলম
চরক	—	চরক-সংহিতা	বরাহমিহির	—	সূর্যসিদ্ধান্ত
শুশ্রুত	—	শুশ্রুত-সংহিতা	ব্রহ্মগুপ্ত	—	ব্রহ্মসিদ্ধান্ত
অশ্বঘোষ	—	বুদ্ধচরিত	হর্ষবর্ধন	—	নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে চরক ও শুশ্রুত লেখাগ্রন্থগুলি চিকিৎসা সংক্রান্ত। শুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শব ব্যবচ্ছেদ বা মড়াকাটা। অথচ ধর্মশাস্ত্রে মড়াকাটা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য শারীরবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসারচর্চা ধীরে ধীরে কমে গেল। গুপ্তযুগে বিজ্ঞানচর্চায় উন্নতি হয়েছিল। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতিবিজ্ঞানী। আর্যভট্ট গণিতে শূন্য সংখ্যার ব্যবহার শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন — পৃথিবী গোলাকার ও নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। বরাহমিহির তাঁর গ্রন্থে বৃষ্টিপাতের পরিমান ও তার আগাম লক্ষণ কি কি, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে খনি ও ধাতু বিজ্ঞান ছিল যথেষ্ট উন্নত। ধাতুবিজ্ঞানের উন্নতির উদাহরণ মেহরৌলির লোহার স্তম্ভটি। স্তম্ভটিতে আজও মরিচা পড়েনি।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা :

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়াও হরেকরকম কারিগরী শিল্পেরও প্রচলন ছিল। প্রাচীন সমাজে স্থাপত্যগুলো মূলত দুটি কারণে তৈরি হতো — ধর্মীয় কারণে ও ব্যক্তিগত কারণে।

ধর্মীয় কারণে বানানো স্থাপত্যগুলি সব মানুষ ব্যবহার করতে পারতো। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠতো।

বাড়ি, প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য ছিল ব্যক্তিগত স্থাপত্য।

মৌর্য আমলে বেশীরভাগ শিল্পের নিদর্শনে ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নজির খুব অল্প। মৌর্য সম্রাটরা আজীবিকদের জন্য পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহা বানিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়ে অনেক স্তুপ বানানো হয়েছিল। সারনাথ ও সাঁচীর স্তূপগুলি বিখ্যাত। অশোকের আমলে বানানো পাথরের স্তম্ভগুলি ভাস্কর্যের নজির। এই স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ সারনাথে রয়েছে।

মৌর্যদের পরবর্তী যুগে ভাস্কর্য বানানোর কাজে পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যবহার দেখা যায়। সুঙ্গ, কুষাণ, সাতবাহন আমলে সাধারণ জীবনের ছাপ শিল্পের উপর পড়েছিল। এইসময় ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেরা নজির— স্তূপ, চৈত্য ও বিহার। এই আমলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম। শক-কুষাণ যুগে গান্ধার ও মথুরার শিল্পরীতি ছিল বিখ্যাত। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম ছিল এই দুই শিল্পরীতির মূল বিষয়। গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত গ্রীক ও রোমান প্রভাব দেখা যায়। মথুরা রীতিতে ভাস্কর্যে লাল চুনাপাথরের বেশি ব্যবহার হতো।

গুপ্ত আমলে প্রথম স্থাপত্য হিসাবে মন্দির বানানো শুরু হয়। মন্দির ইট, পাথর দিয়ে তৈরী হতো আবার পাথর কেটেও তৈরী হতো। এই আমলে দেওঘরের দশাবতার মন্দির বিখ্যাত। পল্লব আমলে মহাবলীপুরমে পাথর কেটে রথের মতো দেখতে মন্দির তৈরী হয়েছিল। গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের সবথেকে বিখ্যাত উদাহরণ মধ্যভারতের অজন্তা গুহার ছবিগুলি। অজন্তা ছাড়াও ইলোরা ও বাঘ গুহাতেও বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

মনে রাখা জরুরি :

- হরপ্পা সভ্যতার লিপি আবিষ্কার হলেও তা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
- বেদ শুনে শুনে মনে রাখতে হত বলে বেদের আর এক নাম শ্রুতি।
- জৈন সাহিত্যগুলি প্রধানত প্রাকৃত ভাষায় ও বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি পালি ভাষায় লেখা হতো।
- সারনাথ ও সাঁচীর স্তুপগুলি অশোকের সময়ে বানানো হয়।
- গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের সব থেকে বিখ্যাত উদাহরণ মধ্যভারতের অজন্তা গুহার ছবিগুলি।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) মৃচ্ছকটিকম কার লেখা?

(খ) পঞ্চতন্ত্রের লেখক কে?

(গ) কে গণিতে শূন্য সংখ্যার ব্যবহার শুরু করেন?

(ঘ) বৌদ্ধ সাহিত্যগুলো কোন ভাষায় লেখা হতো?

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) নালন্দা মহাবিহারে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়তো।

(খ) বরাহমিহির ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

(গ) কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

(ঘ) মহাবলীপুরমের রথমন্দির পল্লব আমলে তৈরি হয়েছিল।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) নাগানন্দ, রত্নাবলী লিখেছেন _____।

(খ) শুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো _____।

(গ) অভিজ্ঞান শকুন্তলম লিখেছিলেন _____।

(ঘ) গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত _____ ও _____ প্রভাব দেখা যায়।

৪. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
গন্ধার শিল্পরীতি	বিষ্ণুশর্মা
অজন্তা	কুষাণ যুগ
গণিতবিদ	গুহাচিত্র
পঞ্চতন্ত্র	আর্যভট্ট

অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা

৪

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মৌর্য আমলের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী আমলের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাম, শহর ও নগর গড়ে ওঠে। রাজার শাসনাধীনে গড়ে ওঠে রাজ্য। সম্রাটের শাসনাধীনে গড়ে ওঠে সাম্রাজ্য। এই রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালাতে গেলে লাগে অর্থ। এই অর্থ আসত কৃষির উৎপাদন থেকে ও ব্যবসা বানিজ্যে কর আদায় করে। কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। কারিগর, শিল্পীরা রোজকার প্রয়োজন মেটাত। এইসব সাধারণ মানুষের পেশা, জীবনযাত্রা আমরা আলোচনা করব, ষোড়শ মহাজনপদের সময় থেকে গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত।

(১) ষোড়শ মহাজনপদের সময়কাল :

অর্থনীতি :

- কৃষিকাজ ছিলো প্রধান জীবিকা। ধানই ছিলো প্রধান ফসল। এছাড়া গম, যব, আখের ফলন হতো।
- কৃষি ছাড়াও পশুপালন ছিলো অন্য জীবিকা।
- লোহার জিনিসপত্র — দা, কুড়ুল, কুঠার, লাঙলের ফলাও পাওয়া গেছে।
- বস্ত্রবয়ন শিল্প ও পুঁতির গয়না তৈরির শিল্পী দেখা যায়।
- স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চলত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এই সময় ধাতুর মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়।
- কালো চকচকে মাটির পাত্র তৈরী হতো।

জীবনযাত্রা :

- হরপ্পা সভ্যতায় প্রায় হাজার হাজার বছর পরে গঙ্গা নদীর উপত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দ্বিতীয় নগরায়ণ ঘটে।
- গ্রামীন বসতির তুলনায় নগরগুলি ছিল বড়ো।
- নারীর অবস্থান ছিল পুরুষদের নীচে।
- বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিলো।

(২) মৌর্য সময়কাল :

অর্থনীতি :

- অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর।
- রাষ্ট্রের তদারকিতে কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ চলতো।
- ব্যবসা ও রাজপথের দেখাশোনার জন্য ছিল রাজকর্মচারী।
- যোদ্ধা ও গুপ্তচরের জীবিকাও প্রাধান্য পেত।

জীবনযাত্রা :

- পশম, রেশম ও সূতির কাপড়ের ব্যবহার হতো।
- নারী ও পুরুষ উভয়ই দামী পাথর ও সোনার গহনা ব্যবহার করতো।
- মাটি,পাথর, ইঁট ও কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী হতো।
- ঘরে নানা ধরনের আসবাবপত্র ও ছবি ব্যবহারের চল ছিলো।

(৩) কুষাণ আমল :

অর্থনীতি :

- উত্তর ভারতে ধান, গম, যব, আখের পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যের কালোমাটিতে তুলার চাষ ও কেরালায় গোলমরিচের ফলন ছিলো বিখ্যাত।
- কৃষিকাজের উন্নতির জন্য এই আমলে জলসেচ প্রকল্পের প্রবর্তন হয়।
- ভারত থেকে মসলিন, হীরে, বৈদুর্যমণি, মুক্তো, মশলা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হতো।
- চিনের রেশম ছিলো আমদানী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। এছাড়াও কাঁচের জিনিসপত্রও আমদানি করা হতো।

জীবনযাত্রা :

- সমাজে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা কঠোর ছিলো।
- অবসর বিনোদনের জন্য নাচ, গান, অভিনয়, জাদু খেলা, পাশা খেলা, শিকার, রথের দৌড়, কুস্তি প্রভৃতির প্রচলন ছিলো।
- পরিবার ছিলো পিতৃতান্ত্রিক। নারীর স্থান ছিলো পুরুষের নীচে।
- দক্ষিণ ভারতে অবশ্য কিছুক্ষেত্রে মায়ের নাম সন্তানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতো। সাতবাহন শাসকদের অনেকের নামই তার প্রমাণ। যেমন — গৌতমীপুত্রী সাতকর্ণী।

(৪) গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী আমল :

অর্থনীতি :

- কৃষিই ছিলো এই সময়কালের প্রধান জীবিকা। ধান, আখ, তুলো, নীল, সরষে ও তৈলবীজের চাষ হতো। দক্ষিণ ভারতে সুপুরি, নারকেল ও নানারকম মশলা পাওয়া যেত।
- গুপ্ত যুগে জমি কেনাবেচা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমিদান ব্যবস্থা চালু হলে ব্যক্তি মালিকানা বৃদ্ধি পায়।
- লোহার জিনিস তৈরীর কারিগর, লেখক, করণিক, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার লোক ছিলো।
- এই আমলে বণিকগ্রাম নামে বণিকদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠেছিলো।

জীবনযাত্রা :

- সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিলো।
- বাবা ছিলেন পরিবারের প্রধান।
- মেয়েদের বাল্যবিবাহের রীতি প্রচলিত ছিলো। মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেতেন। ঐ সম্পদের উপরে কেবল ঐ মেয়েরই অধিকার ছিলো। একে স্ত্রী ধন বলা হতো।
- দামী ধাতু ও পাথরের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিলেন।

মনে রাখা জরুরি :

- ষোড়শ জনপদের সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতুর মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়।
- মৌর্য আমলে নারীপুরুষ উভয়েই দামী পাথর ও সোনার তৈরি গয়না পরতেন।
- কুষাণ আমলে মসলিন, হিরে, বৈদূর্যমণি, মুক্তো ও মশলা বিদেশে রপ্তানি করা হতো।
- কুষাণ যুগে সমাজে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা কঠোর ছিল।
- গুপ্ত ও পরবর্তী আমলে বণিকদের নিজস্ব সংগঠনকে বণিকগ্রাম বলা হতো।
- মেয়েরা বিয়ের সময়ে কিছু সম্পদ পেতেন, যাকে স্ত্রীধন বলা হতো।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) মহাজনপদের আমলে মানুষের প্রধান জীবিকা কী ছিলো?

(খ) প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয় 'নগরায়ণ' কোথায় হয়েছিলো?

(গ) কুষাণ আমলে কোথায় গোলমরিচ উৎপাদন হতো?

(ঘ) গুপ্ত আমলে দক্ষিণ ভারতে কী কী ফসল উৎপাদিত হতো?

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালে _____ ছিল প্রধান ফসল।

(খ) কুষাণ শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে _____ চাষ হতো।

(গ) কুষাণ আমলে চিনের _____ ছিল আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান।

(ঘ) দক্ষিণ ভারতে _____ সন্তানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতো।

৩. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) কুষাণ যুগে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক।

(খ) গুপ্তযুগে ভূমিদান ব্যবস্থা চালু ছিল।

(গ) ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালে কৃষি ছাড়াও পশুপালন ছিল গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা।

(ঘ) মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেত, যাকে স্ত্রীধন বলা হতো।

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার ইতিহাস : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক

৫

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণ ব্যাখা করতে পারবে।
- মৌর্য ও মৌর্য-পরবর্তী যুগে বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতে যেসব শাসক রাজত্ব করেছেন, তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

সাম্রাজ্য বলতে বোঝায় একটি বড়ো রাজ্য। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি যিনি শাসন করেন তাকে বলা হয় রাজা বা সম্রাট। কোনো রাজ্য যখন যুদ্ধের দ্বারা অন্য রাজ্য জয় করে তার সাম্রাজ্যের সীমানাকে বর্ধিত করেন তখন তাকে বলা হয় সাম্রাজ্যের বিস্তার। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে ভারতে ছোটো ছোটো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে মগধ রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক বিশাল সাম্রাজ্য। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে সপ্তম শতকে যে রাজবংশগুলি ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের কথা আমরা জানব।

নিচের ছকটি লক্ষ্য করো :

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য	উল্লেখযোগ্য শাসকগণ	উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহ
মৌর্য সাম্রাজ্য	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫/৩২৪–৩০০ অব্দ)	● মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ● ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে
	অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩/২৩২ অব্দ)	● কলিঙ্গ জয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ানো ● প্রিয়দর্শী উপাধি লাভ ● তাঁর ধম্মনীতি বা ধর্মনীতি-র মাধ্যমে জনগণকে একজোট করার চেষ্টা ● বৌদ্ধ রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মানুষ ও পশুপাখিদের ওপর হিংসা বন্ধ করেন

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য	উল্লেখযোগ্য শাসকগণ	উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহ
কুষাণ সাম্রাজ্য	কুজুল কদফিসেস	● কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান কৃতিত্ব
	বিম কদফিসেস	● শক্তিশালি কুষাণ শাসক ● ভারতে প্রথম সোনার মুদ্রার প্রচলন করেন
	প্রথম কণিষ্ক	● কুষাণদের সেরা রাজা ● শকাব্দ-এর প্রচলন ● সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার ● রাজধানী ছিল পুরষপুর বা পেশোয়ায়
সাতবাহন সাম্রাজ্য	সিমুক	● সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ● তার সময় প্রতিষ্ঠান ও নানাঘাট অঞ্চলে তাদের শাসন ছিল ● এইসময় থেকে শক-ক্ষত্রপদের সাথে লড়াই এর সূচনা
	গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী	● শক–ক্ষত্রপদের পরাজিত করে গুজরাটের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে, মালবেও তার অধিকার কায়েম করেন ● এই সময় শকদের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন রুদ্রদামন যিনি মহাক্ষত্রপ উপাধি নিয়েছিলেন
গুপ্ত সাম্রাজ্য	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩১৯–৩২০ খ্রিস্টাব্দ)	● প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও গুপ্তাব্দের প্রচলন
	সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫–৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ)	● এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড়ো আকার ধারণ করেছিল ● উত্তর ভারতে নয়জন শাসক ও দাক্ষিণাত্যে ১২ জন রাজাকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন
	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ)	● শকক্ষত্রপ শাসন উচ্ছেদ করেছিলেন বলে তাকে ‘শকারি’ বলা হয়ে থাকে

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য	উল্লেখযোগ্য শাসকগণ	উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহ
	প্রথম কুমারগুপ্ত	● তাঁর আমলে রূপোর মুদ্রা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের মুদ্রার প্রচলন হয় ● সাম্রাজ্যের আয়তন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ● নালন্দা মহাবিহার এই সময় স্থাপিত হয়
	স্কন্দগুপ্ত	● ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পশ্চিমে হুণ আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন ● গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক
বাকাটক সাম্রাজ্য	দ্বিতীয় রূদ্রসেন	● খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য ভারতের বড়ো এলাকা জুড়ে বাকাটক শাসন ছিল ● দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কণ্যা প্রভাবতীগুপ্তর বিয়ে হয়েছিল বকাটক রাজা দ্বিতীয় রূদ্রসেনের সাথে ● তাঁর মৃত্যুর পর প্রভাবতী দেবীই শাসন চালিয়েছিলেন

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত যে রাজবংশ গুলি ভারতে রাজত্ব করেছিল তাঁরা কেন্দ্রীভূত শাসনের দ্বারা সাম্রাজ্যকে শক্তভাবে তৈরি করেছিলেন। উন্নত শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। রাজাই ছিল প্রকৃত শাসক। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে সমগ্র সাম্রাজ্য ছোটো ছোটো অংশে ভাগ হয়ে যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক শাসন গড়ে ওঠে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— পুষ্যভূতি বংশের শাসক হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন চেষ্টা করেছিলেন সাম্রাজ্য গড়ার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই শাসন লোপ পায়। বৃহৎ সাম্রাজ্যের বদলে গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য।

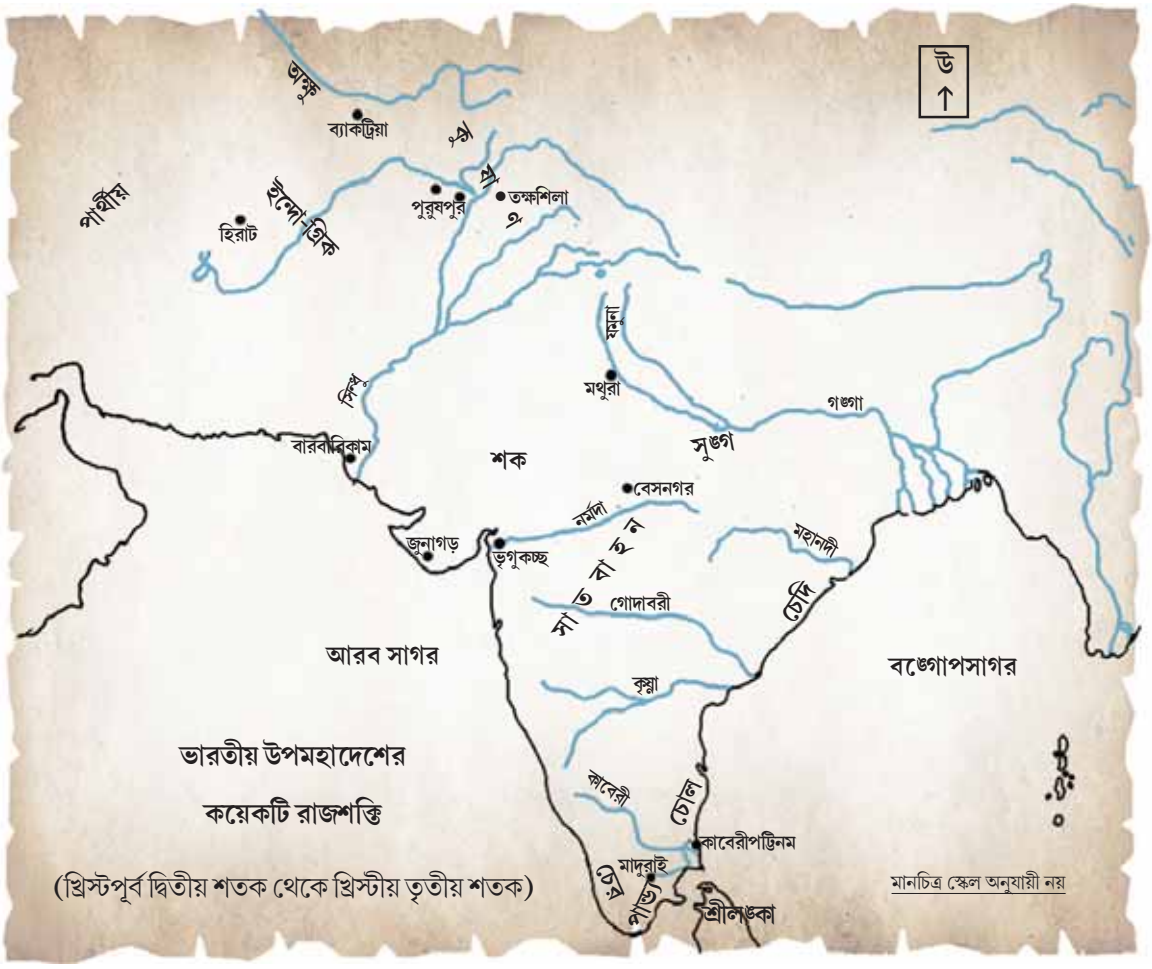

মনে রাখা জরুরি :

- যে নীতির মাধ্যমে কোন বড় রাজ্যের রাজা তাঁর রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন, তাকে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বলা হয়।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালে মৌর্য, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত ও বাকাটক রাজারা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।
- এই সময়কালে রাজত্বকারী শাসকরা তাদের শাসনকালকে সুদৃঢ় করতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য _____।

(খ) প্রিয়দর্শী উপাধি নিয়েছিলেন _____।

(গ) কুষাণ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন _____।

(ঘ) সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা _____।

(ঙ) হুন আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন _____।

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বিম কদফিসেস।

(খ) শকাব্দের প্রচলন করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

(গ) গুপ্তাব্দের প্রচলন করেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

(ঘ) কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল অশোকের সময়।

(ঙ) পুষ্যভূতি বংশের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন।

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) সমুদ্রগুপ্ত কেন স্মরণীয়?

(খ) কণিষ্কের সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লেখো।

(গ) কাকে, কেন 'শকারি' বলা হয়?

ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ

৬

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে বর্হিবিশ্বের কোন কোন দেশের যোগাযোগ ছিল, তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- ভারতের সঙ্গে বর্হিবিশ্বের যোগাযোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কি কি প্রভাব পড়েছিল— তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে বাইরের বহু দেশের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই যোগাযোগের নানারকম দিক বা মাধ্যম ছিল।

নীচে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হল —

ভারত ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম/ নানাদিক

→ বিদেশী জাতির আগমন
→ রাজ্যজয় ও দূতবিনিময়
→ ব্যবসা বাণিজ্য
→ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
→ ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রা
→ পড়াশোনা

রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম :

সভ্যতা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিভিন্ন বহির্দেশীয় জাতি বিভিন্ন পথে ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসন কায়েম করেছিল। এই জাতিগুলির মধ্যে ছিল— পারসিক, গ্রিক, ব্যাকট্রিয়, শক, পহ্লব ও কুষাণ। তাদের প্রভাব ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পড়েছিল।

কোন কোন বিদেশী জাতি ভারতের কোন কোন অঞ্চলে শাসন করেছিল তার তালিকা দেওয়া হল:—

বহির্দেশীয় জাতি	ভারতে অধিকৃত অঞ্চল সমূহ	উল্লেখযোগ্য রাজা ও ঘটনাবলী
পারসিক	গন্ধার ও নিম্ন সিন্ধু এলাকা	● শ্রেষ্ঠ শাসক প্রথম দরায়ুস (খ্রি. পূ. ৫২২-৪৮৬ অব্দ) ● প্রাদেশিক শাসক বা স্যাট্রাপদের নিয়োগ
গ্রিক	ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশ	● আলেকজান্ডার ও সেলুকাস ● আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ছোট ছোট শক্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে মগধের ক্ষমতা বিস্তার সহজ হয় ● ইন্দো-গ্রিক উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন মিনান্দার

বহির্দেশীয় জাতি	ভারতে অধিকৃত অঞ্চল সমূহ	উল্লেখযোগ্য রাজা ও ঘটনাবলী
শক	কাশ্মীর, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের এলাকা ও তক্ষশিলা	● মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণের ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক শাসন শেষ হয়। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়রা। উপমহাদেশে তারা শক নামে পরিচিত
পার্থীয় বা পহ্লব	গন্ধার, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পাঞ্জাবের কিছু অংশ ও সিন্ধু উপত্যকা	● গন্ডোফারনেসের রাজত্বকাল শুরু হয় ২০ বা ২১ খ্রিস্টাব্দে ● তিনি নিজের মুদ্রায় রাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করেছিলেন

দূত বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ :

ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগের আরও একটি মাধ্যম হল দূত বিনিময়। এই দূত বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান হয়েছিল—

- পহ্লব রাজা গন্ডোফারনেস খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন।
- গ্রীক রাজা সেলুকাস মেগাস্থিনিস ও ডায়ামাকাস কে মৌর্য রাজদরবারে দূত করে পাঠিয়েছিলেন।
- মিশরের শাসক টলেমি ডায়োনিসিয়াসকে মৌর্য দরবারে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। মৌর্য সম্রাটরা বিভিন্ন দেশে তাদের দূত পাঠাতেন।
- সম্রাট অশোক সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি দেশে দূত পাছিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেছিলেন।
- হর্ষবর্ধন দূত বিনিময়ের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন।

অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম:

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের জলপথ ও স্থলপথে বাণিজ্যিক যোগযোগ ছিল।

রোম সাম্রাজ্যে চীন ও ভারতের নানা জিনিসের চাহিদা ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কদর ছিল চিনা রেশমের। তাকালামাকান মরুভূমি এড়িয়ে দুটি পথে চিনা রেশম নিয়ে যাওয়া হতো। সেখান থেকে বিভিন্ন-পথ পেরিয়ে রেশম ভূমধ্যসাগর এর পূর্বদিকে পৌঁছাতো। এই পথকে 'রেশম পথ' বলা হতো।

নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও ভারতের কোথায় তা অবস্থিত তার ছক দেওয়া হল।

বাণিজ্যিক বন্দর	ভারতে কোথায় অবস্থান
ভৃগুকচ্ছ	ভারতের পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর। নর্মদা নদী তীরে অবস্থিত
কল্যাণ	উত্তর ও কোঙ্কন উপকূলে অবস্থিত
কাবেরীপট্টিনম	কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ এলাকায় অবস্থিত
তাম্রলিপ্ত	প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ :

বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলি দীর্ঘদিন ভারতে রাজত্ব করেছিল ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

- পারসিক আমলে প্রচলিত আরামীয় ভাষা ও লিপির অনুকরণে সম্রাট অশোক খরোষ্ঠী লিপি তৈরী করেছিলেন।
- ভারতীয়রা গ্রিকদের কাছ থেকে মুদ্রা তৈরি করতে শিখেছিল। গণিত ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায় গ্রিক ও ভারতীয় ভাবনাচিন্তায় বিনিময় দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয় গ্রিক প্রভাবিত শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল, যা 'গন্ধার শিল্প' নামে পরিচিত ছিল।
- যুদ্ধরীতি, পোশাক, ধর্মের ক্ষেত্রে শক, পহ্লব ও ভারতীয়রা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। এমনকি গ্রিক নাট্যচর্চার প্রভাব ভারতীয়দের ওপর পড়েছিল। গ্রিকদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা মঞ্চ বানানো, পর্দা (যবনিকা) ফেলা শিখেছিল।

ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রা :

- বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের আর একটি মাধ্যম ছিল। এই ধর্ম প্রচারের জন্য ভারত থেকে বহু পন্ডিত যেমন বিদেশে যেতেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও জনপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মের কথা জানতে ভারতে আসতেন। চিনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কুমারজীবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
- বুদ্ধযশ নামক বৌদ্ধ পন্ডিত পড়াশোনার শেষে মধ্য এশিয়ায় চলে যান।
- পন্ডিত পরমার্থ গিয়েছিলেন চিনে বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা করতে।

ভারত থেকে চীনে বহু শিক্ষক যাতায়াত করতেন, এর ফলে বহু মানুষ ভারতে আসা শুরু করেন। তারা পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেন। তাও নান, ফাসিয়ান, সুয়ান জাং ভারতে পড়াশোনা শেখার জন্য এসেছিলেন। তারা ভারতে এসে যে সমস্ত শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে নালন্দা মহাবিহারের পন্ডিত নীলভদ্র ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পড়াশোনার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে নালন্দা মহাবিহারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখা জরুরি :

- প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।
- স্থলপথ ও জলপথের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।
- বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকায় নানান সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) পারসিকদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন _____।

(খ) ইন্দো-গ্রিক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন _____।

(গ) সেলুকাস _____ কে দূত করে মৌর্য দরবারে পাঠিয়েছিলেন।

(ঘ) গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায় _____ শিল্পে।

(ঙ) সম্রাট অশোক বিভিন্ন দেশে দূত পাঠিয়ে _____ ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

২. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) একজন ইন্দো-গ্রীক রাজার নাম লেখো।

(খ) কুষাণরা কোন জাতির শাখা ছিলেন?

(গ) ভারতের পশ্চিম উপকূলে সেরা বন্দর কোনটি?

(ঘ) কোন ভাষার অনুকরণে খরোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়?

(ঙ) ভারতে আক্রমণকারী 'শক'রা কী নামে পরিচিত?

৩. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) কাবেরী নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ বন্দরটি অবস্থিত।

(খ) গ্রীকদের কিছু রাজা ব্যাকট্রিয় ছিলেন।

(গ) প্রথম দরায়ুস দূত বিনিময়ের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন।

(ঘ) চীনের সম্রাট ছিলেন আলেকজান্ডার।

(ঙ) ভারতের সঙ্গে বর্হির্বিশ্বের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল খেলাধুলা।

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) কোন কোন মাধ্যমে ভারত ও বর্হির্বিশ্বের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল?

(খ) ভারত ও বর্হির্বিশ্বের বাণিজ্যিক যোগাযোগে 'রেশম পণ্যের' ভূমিকা কী?

নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) রামচরিতের বিষয়বস্তু কী?

(খ) বল্লালসেনের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো?

(গ) প্রত্নবস্তু কীভাবে ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে?

(ঘ) প্রশস্তি কী?

(ঙ) মুদ্রা কেন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ?

(চ) শিল্পবস্তু কতরকমের ও কী কী?

(ছ) হর্ষচরিত কেমন ধরণে লেখা? এটি কে লেখেন?

(জ) 'শকারি' কাকে বলা হয় এবং কেন?

(ঝ) মৌর্যদের সেনাবাহিনী কেমন ছিলো?

(ঞ) মিলিন্দ পঞ্ঞহো গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক।

(খ) কণিষ্কের সময় থেকে 'হর্ষাব্দ' গণনা শুরু হয়।

(গ) নতুন পাথরের যুগে মানুষ প্রথম খাদ্য উৎপাদন শুরু করে।

(ঘ) বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন আলাউদ্দিন খলজি।

(ঙ) ফিরোজ তুঘলকের আমলে চার ধরণের কর আদায় হত।

(চ) কৃষির ওপর নির্ভর করে মানুষ স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে।

(ছ) বর্ষবর্ধনের সিংহাসনে বসার পর থেকে 'শকাব্দ' গোনা শুরু হয়।

(জ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য 'প্রিয়দর্শী' নামে পরিচিত।

(ঝ) মহাজনপদগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে মগধ।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করেছিল _____ ।

(খ) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক _____ ।

(গ) ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে _____ কেন্দ্র করে।

(ঘ) 'শিলাদিত্য' উপাধি নিয়েছিলেন _____ ।

(ঙ) আইহোল প্রশস্তি রচনা করেন_____ ।

৪. **সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটা বাক্যে) :**

(ক) ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার কেমন পরিচয় পাওয়া যায় লেখো।

(খ) সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধজয় সম্পর্কে লেখো।

(গ) চৈতন্য ভাগবত কে লেখেন। গ্রন্থটিতে চৈতন্যের প্রতি হোসেন শাহ-এর কেমন মনোভাব ফুটে উঠেছে।

(ঘ) ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যগুলির সমস্যা কী কী?

(ঙ) অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন? এর বিষয়বস্তু কী?

দিল্লি সুলতানি

৭

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মধ্যযুগের ভারতে কোন কোন বিদেশী জাতি ৩টি উদ্দেশ্যে ভারত অভিযান ও ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল— তা বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন সুলতানের আমলে দিল্লি তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে।
- বিভিন্ন দিল্লি সুলতানদের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বাইরের দেশ থেকে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে অভিযান চালিয়েছিল। তবে একথা বলা যায় যে, বেশিরভাগ জাতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কি শাসক মহম্মদ ঘুরি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতে আসেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ চৌহানের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। তারপরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বিরাজ চৌহানকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময় তার অন্যতম সঙ্গী ও অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে 'সুলতানি শাসন' প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লী সুলতানির বিভিন্ন রাজবংশ

	সুলতানি রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	উল্লেখযোগ্য শাসক	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বিষয়
১.	মামেলুক (দাস) (১২০৬-১২৯০) খ্রি.	কুতুবউদ্দিন আইবক	ইলতুৎমিস	• দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা • আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও খলিফা কর্তৃক অনুমোদন লাভ • বন্দেগান-ই-চিহলগানি (চল্লিশচক্র) প্রতিষ্ঠাতা
			রাজিয়া	• দিল্লি সুলতানির প্রথম ও শেষ নারী শাসক
			বলবন	• দিল্লি সুলতানির প্রধান সমস্যা — আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা • দরবারে সিজদা (সুলতানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা) ও পাইবস (সুলতানের পদযুগল চুম্বন করা) প্রথা চালু
২.	খলজি (১২৯০-১৩২০) খ্রি.	খলজি বিপ্লবের মাধ্যমে সিংহাসন লাভ: জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি	আলাউদ্দিন খলজি	• দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার • শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন • সৈন্যদের বাসস্থান হিসেবে সিরি নামক নতুন শহর প্রতিষ্ঠা • মোঙ্গল আক্রমণ স্বহস্তে দমন

	সুলতানি রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	উল্লেখযোগ্য শাসক	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বিষয়
৩.	তুঘলক (১৩২০-১৪১২) খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন তুঘলক	মহম্মদ বিন তুঘলক	● রাজ্যের ব্যয়সংকুলানের জন্য বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ও এই ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য 'শাহানা-ই-মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' নামক রাজকর্মচারী নিয়োগ ● সুলতানি আমলে প্রথম রেশন ব্যবস্থার প্রচলন ● দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে অপারগ প্রজাদের বিদ্রোহ ও শেষে তার প্রতিকার হিসেবে প্রজাদের ঋণ দানে সমস্যার সমাধান ● দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করে তার নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। এক্ষেত্রে বাধ্য করেন দিল্লিবাসীদের স্থান পরিবর্তন করতে। কিন্তু পথে দূর্ঘটনায় নাগরিকদের মৃত্যু হলে তাদের আবার স্বরাজ্যে ফেরত পাঠান ● রাজ্যে সোনা, রূপার ঘাটতি মেটাতে তামার নোটের প্রচলন। তাতে প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে সকলে জাল নোট তৈরি করতে শুরু করে। দেশে জাল নোটে ছেয়ে গেলে তিনি তামার নোট তুলে নেন ও পুরাতন নোট চালু করেন। এতে রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়
			ফিরোজ শাহ তুঘলক	● জনকল্যাণমূলক সংস্কার হিসেবে নগর, মসজিদ মাদ্রাসা ও হাসপাতাল তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ। ● দরিদ্রদের সাহায্যার্থে ও বেকার সমস্যা সমাধানে দপ্তর স্থাপন ● বাংলায় ইলিয়াস শাহকে পরাজিত করে দুর্ভেদ্য একডালা দূর্গ জয়
৪.	সৈয়দ (১৪১৪-১৪৫১) খ্রি.	খিজির খাঁ	খিজির খাঁ	● এই বংশের মাধ্যমে সুলতানি যুগে আফগানদের অভ্যুদয় ● অন্য বংশের শাসক হয়েও তুঘলক আমলের মুদ্রার প্রচলন যা মধ্যযুগের বিরল ঘটনা
৫.	লোদী (১৪৫১-১৫২৬) খ্রি.	বহলুল লোদী	সিকান্দর লোদী	● দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী পরিবর্তন ও আগ্রা শহরের উন্নতিসাধন তার আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

সুলতানি রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	উল্লেখযোগ্য শাসক	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বিষয়
		ইব্রাহিম লোদী	• আফগান সর্দারদের সাথে ক্ষমতার আদান প্রদান • ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের কাছে পরাজয় • সুলতানি আমলের পতন ও দিল্লিতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা

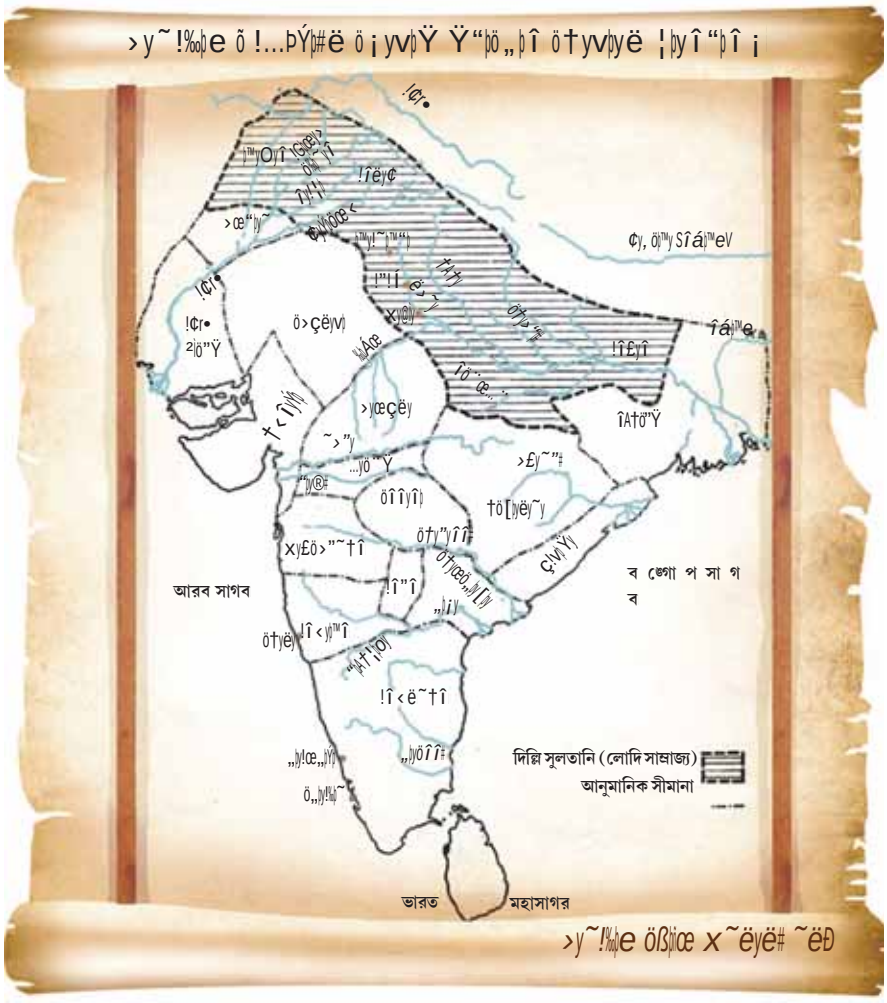

মনে রাখা জরুরি :

- মধ্যযুগের ভারতে নানান বিদেশী জাতি মূলতঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত অভিযান চালায়।
- বিভিন্ন রাজবংশ যেমন— মামেলুক, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী ভারতবর্ষে শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যা দিল্লি সুলতানি শাসন নামেই খ্যাত।
- দিল্লি সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) কবে, কাদের মধ্যে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল?

(খ) কে, কবে ভারতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল?

(গ) দিল্লি সুলতানির প্রথম ও শেষ নারী শাসক কে?

(ঘ) কোন সুলতান রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

২. ডানদিকের সাথে বামদিক মিলিয়ে লেখ :

ডানদিক	বামদিক
(i) চল্লিশ চক্র	(ক) ফিরোজ শাহ তুঘলক
(ii) সিজদা ও পাইবস	(খ) ইলতুৎমিস
(iii) তামার মুদ্রার প্রচলন	(গ) বলবন
(iv) একডালা দূর্গ	(ঘ) মহম্মদ বিন তুঘলক।

৩. নিম্নলিখিত বছরগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন একটি করে বাক্যে লেখো :

(ক) ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ

(খ) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ

(গ) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) সিজদা ও পাইবস কী?

(খ) আলাউদ্দিন খলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখো।

(গ) মহম্মদ বিন তুঘলকের যেকোনো দুটি শাসন সংস্কারের পরিচয় দাও।

দিল্লি সুলতানির অর্থনীতি

৮

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- দিল্লি সুলতানির কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে দিল্লির সুলতানরা কোন কোন পন্থা অনুসরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
- দিল্লি সুলতানি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দিল্লি সুলতানির কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোনো শাসনকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে হলে তার অর্থনৈতিক ভীত সুদৃঢ় করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। রাজস্বের আয় বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

নীচে দেখে নেবো কী কী উপায়ে সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল —

- যুদ্ধে ধনরত্ন লুণ্ঠনের দ্বারা
- নানাপ্রকার কর আরোপের মাধ্যমে
- বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করে (আলাউদ্দিন খলজি)
- ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের মাধ্যমে

যুদ্ধে ধনরত্ন লুণ্ঠনের দ্বারা :

দিল্লির সুলতানদের যুদ্ধ করার দুটি উদ্দেশ্য ছিল— (i) সাম্রাজ্যবিস্তার ও (ii) ধনসম্পদ লুণ্ঠন। এই ধনসম্পদ লুণ্ঠনের দ্বারা সুলতানরা তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।

কর আরোপ :

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন কেউ যাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করতে না পারে। তার অধীনস্থ সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে সর্বত্র করের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলের উৎপত্তি ফসলের ৫০ ভাগ রাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। ওই অঞ্চলে বছরে দু-বার শস্য উৎপাদিত হতো তাই তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ও অমুসলমান প্রজাদের থেকে জিজিয়া কর, গোচারণ কর, বাসস্থান কর ইত্যাদি নানারকম কর আদায় করতেন। দিল্লি সুলতানিতে ব্রাহ্মণ, নারী, নাবালক, দাস, সন্ন্যাসী, ফকির, অন্ধ ও উন্মাদ ব্যক্তিরা যদি গরিব হতেন তবে তাদের জিজিয়া দিতে হতো না। আলাউদ্দিনের উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী অমুসলমান ব্যক্তির রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা কমানো, কারণ তিনি মনে করতেন তারাই সাম্রাজ্যে নানারকম অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দিত। আলাউদ্দিন খলজি নগদ টাকায় কর আদায় করতেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলেও চার ধরনের কর আদায় করা হতো— (১) খরাজ (২) খামস্ (৩) জিজিয়া ও (৪) জাকাত।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ :

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ আলাউদ্দিন খলজির একটি মৌলিক পদক্ষেপ। আলাউদ্দিন খলজির বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। এই বিশাল বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো কিন্তু সৈন্যদের বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না। জীবনধারণের জিনিস যাতে সৈন্যবাহিনী কম দামে কিনতে পারে সেই জন্যে তিনি বাজারের জিনিস পত্রের দাম কমিয়ে দিয়েছিলেন। দোকানদাররা যাতে ক্রেতাকে ওজনে ঠকাতে না পারে ও সঠিক নিয়মে চলে তার দেখাশোনা করার জন্য 'শাহনা-ই-মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' নামক রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী লিখে গেছেন যে, আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টির দিনেও শস্যের ঘাটতি দেখা যেত না। সুলতানি আমলে প্রধান মুদ্রা ছিল সোনার মোহর, রুপোর তঙ্কা ও তামার জিতল। শেষেরদিকে অবশ্য রুপো ও তামা মেশানো মুদ্রাও চালু হয়েছিল।

Ýþ„þöî y „þí y

²Ì!“þ ›ö’î ”y› !‹“þöœî !£¢yöî

þ™’Äoîİ	xyœyvþ! j˜ …œ!‹	›£Á¿” !î˜ “þ‡œ„þ	!Šþöîy‹ Ÿy£ “þ‡œ„þ
†›	$7^1/_2$	12	8
ëî	4	8	4
•y˜	5	14	ôôô
vþyœ	5	ôôô	4
›¢î	3	4	4
!‰þ!˜	100	80	ôôô
ö¦þvþyî ›y‚¢	10	64	ôôô
!‡	16	ôôô	100

öŸy˜y ëyë ›£Á¿” !î˜ “þ‡œö„þî ¢›öë îy‚œyë ˜y!„þ !‹!˜¢þ™öeî ”y› !Šþœ …î ¢ßþyÐ £î˜ î“þ“þy îy‚œyë !‹!˜¢þ™öeî ”yö›î ~„þÝþy “þy!œ„þy !”öëöŠ˜ôôô

~„þ!Ýþ ›î!†	1 !‹“þœ
þ™ö˜öîy!Ýþþ þ™yëîy	8 !‹“þœ
~„þ!Ýþ ö¦þvþy	16 !‹“þœ
!“þ!îŸ £y“þ œÁy …î ¦þyöœy „þyþ™vþ	2 “þA„þy
‰þyœ S²Ì!“þ ›’V	8 !‹“þœ
~„þ!Ýþ Šy†œ	3 “þA„þy
!‰þ!˜ S²Ì!“þ ›’V	32 !‹“þœ

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প :

দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। এর নানা কারণ ছিল—

- খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতানরা পুরানো শহরগুলিকে সংস্কার করে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলেন। এই নতুন শহরগুলিতে সুলতান, অভিজাত ও উচ্চবিত্তরা বসবাস করতো। শহরগুলোতে নিত্য প্রয়োজনীয় শৌখিন জিনিসপত্র ও বাড়িঘর তৈরির কাচামালের জোগানের জন্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

- অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষিজাত পণ্য। তাই কৃষিজাত পণ্যেরও বাণিজ্য হতো। কারণ প্রজাদের নগদ টাকায় সুলতানকে কর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

- হস্তশিল্প বাণিজ্যও বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল বাণিজ্যের বিস্তারে। চামড়া, কাঠ ও ধাতুর তৈরি জিনিস, গালিচা ইত্যাদি পণ্য বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। এই সময় ভারতে প্রথম কাগজ তৈরি করা শুরু হয়।

- সুলতানি আমলে দাসদের পণ্যরূপে ব্যবহার করা হতো। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের দাসে পরিণত করা হতো। যুদ্ধবন্দী দাসদের ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি করা হতো। ওইসব দেশ থেকে আমদানি করা হতো ঘোড়া, কাচের তৈরি সামগ্রী, সাটিন কাপড় ইত্যাদি। সুলতানরা ভালো ঘোড়া আমদানিতে উৎসাহ দিতেন কারণ ভারতে ভালো মানের ঘোড়া জন্মাত না। ভালো ঘোড়া আমদানি করা হতো পারস্য, এডেন ও ইয়েমেন থেকে। সুলতানি আমলের প্রথম দিকের দুটি বন্দর ছিল গুজরাটের ব্রোচ ও ক্যাম্বে। আলাউদ্দিন খলজি গুজরাট জয় করলে দিল্লি সুলতানির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এভাবেই সুলতানি সাম্রাজ্যের ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- দিল্লি সুলতানির কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- দিল্লি সুলতানি আমলের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যুকো ধনরত্ন লুণ্ঠন, বিবিধ কর আরোপ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করা হত।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ এবং কিছু ক্ষেত্রে বাজারদর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হত।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) সুলতানি যুগে অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল _____।

(খ) সুলতানি যুগে ভারতে প্রথম _____ তৈরি হয়।

(গ) আলাউদ্দিন খলজির একটি মৌলিক পদক্ষেপ হল _____।

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজি নগদ টাকায় _____ নিতেন।

(ঙ) হিন্দু ও অমুসলমান প্রজাদের _____ কর দিতে হতো।

২. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) দিল্লির সুলতানদের যুদ্ধ করার পেছনে দুটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখো।

(খ) বাজারদর নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন খলজি কোন কোন কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন?

(গ) ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে কর ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখো।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিনটি-চারটি বাক্যে) :

(ক) আলাউদ্দিন খলজির অর্থনৈতিক সংস্কারের বর্ণনা দাও।

(খ) সুলতানি যুগের অর্থনীতির বিকাশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কী ভূমিকা ছিল?

বিজয়নগর সাম্রাজ্য

৯

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থানের পেছনে যাদের অবদান ছিল— তা বর্ণনা করতে পারবে।
- বিজয়নগর রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিজয়নগর রাজ্যে রাজত্বকারী বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান :

১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শোনা যায় যে, সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির দুই ছেলে প্রথম হরিহর ও বুক্ক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজ্যে বহু বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইতালির নিকোলো কন্টি, পারস্যের দূত আব্দুর রাজ্জাক, পোর্তুগীজ পর্যটক পেজ ও নুনিজ, বারবোসা প্রমুখ। এদের ভ্রমণ কথা থেকে আমরা বিজয়নগর রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

বিজয়নগরের রাজনৈতিক ইতিহাস :

- ১৩৩৬ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ বিজয়নগরে রাজত্ব করেছিল। এই বংশগুলি হল সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিডু।
- সঙ্গম বংশের রাজারা প্রায় দেড়শো বছর রাজত্ব করেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেব রায়।
- সঙ্গম রাজা বিরূপাক্ষকে পরাজিত করে নরসিংহ সালুভ, 'সালুভ' বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- যোগ্য শাসক না থাকায় সালুভ বংশের সেনাপতির ছেলে বীরসিংহ সালুভ বংশ উচ্ছেদ করে তুলুভ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়।
- পতুর্গীজ পর্যটক পেজ রাজা কৃষ্ণ দেব রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতে, তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও মহান শাসক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সীমানা ও গৌরব বাড়িয়েছিলেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার করেছিলেন। শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে উন্নতি তার আমলে লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজে একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। তেলুগু ভাষায় লেখা 'আমুক্তমাল্যদা' গ্রন্থে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।
- কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তুলুভ বংশের আমলে বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের উত্তরসূরি পাঁচটি সুলতানি রাজ্যের মিলিতভাবে যুদ্ধ হয়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বানিহাটি বা তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় ঘটে।
- বানিহাটির যুদ্ধের পর তুলুভ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে ও আরাবিডু বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। এই বংশের প্রথম শাসক তিরুমল ও শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট।

নিম্নে বিজয়নগর রাজ্যের রাজবংশ ও রাজাদের নামের তালিকা দেওয়া হল :-

সময়কাল :- ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ

বিজয়নগর রাজ্যের রাজবংশ

(১) সঙ্গম বংশ	(২) সালুভ বংশ	(৩) তুলুভ বংশ	(৪) আরবিডু বংশ
প্রথম হরিহর ও বুক্ক (প্রতিষ্ঠাতা) দ্বিতীয় দেব রায় (শ্রেষ্ঠ শাসক) বিরূপাক্ষ (শেষ শাসক)	নরসিংহ সালুভ (প্রতিষ্ঠাতা)	বীরসিংহ সালুভ (প্রতিষ্ঠাতা) কৃষ্ণদেব রায় (শ্রেষ্ঠ রাজা)	তিরুমল (প্রথম শাসক বা রাজা) দ্বিতীয় বেঙ্কট (শেষ শাসক)

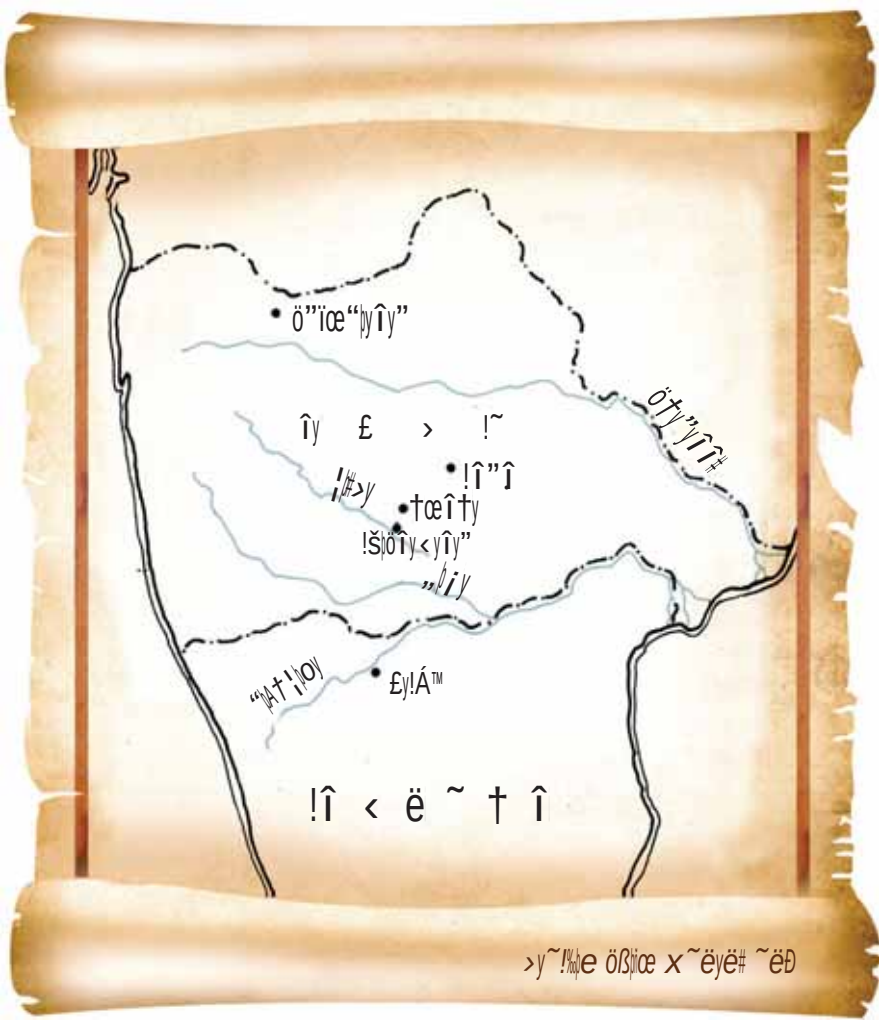

বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ ও অর্থনীতি :

বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা ও রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের লেখা 'আমুক্তমাল্যদা' গ্রন্থ থেকে এই নগরের সামাজিক জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা ও এই নগরীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেক পর্যটক এই নগরীর সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে এই রাজ্যে এসেছিলেন। ধনী ও গরিব দুভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। এদের জীবনযাপনে যথেষ্ট তফাত ছিল। শহরের বাড়িগুলি সুন্দর করে সাজানো ছিল। নগরের লোকসংখ্যা ছিল অসংখ্য। রাস্তায় অলিতে-গলিতে এত লোক ও হাতি চলাচল করত যে তার মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহী বা পদাতিক কোনো সৈন্য যাতায়াত করতে পারত না। এই শহরে বসবাসকারী মানুষের খাওয়াপরায় কোনো অভাব ছিল না।

অর্থনৈতিক জীবন :

কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। ভূমি রাজস্ব ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পোর্তুগীজদের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। পর্যটক পেজের বর্ণনায় বিজয়নগরের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা জানা যায়। বিদেশী পর্যটকরা বিজয়নগরের সম্পদ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

মনে রাখা জরুরী :

- ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৩৩৬-১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ যথা, সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিডু বিজয়নগরে রাজত্ব করেছিল।
- বিজয়নগর রাজ্যে আগত বিদেশী পর্যটকরা হলেন— নিকোলো কন্টি, আব্দুর রজ্জাক, পেজ, নুনিজ, বারাবাসা প্রমুখ।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(খ) বিজয়নগর রাজ্যে আগত দুজন বিদেশী পর্যটকের নাম লেখ।

(গ) বিজয়নগর রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত?

(ঘ) বানিহাটির যুদ্ধ কবে হয়েছিল?

(ঙ) বিজয়নগরে মোট কটি বংশ রাজত্ব করেছিল?

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সঙ্গম বংশের প্রথম রাজা _____ ।

(খ) পেজ ছিলেন _____ পর্যটক।

(গ) 'আমুক্তমাল্যদা' গ্রন্থটি _____ রচনা করেছিলেন।

(ঘ) অরবিভু বংশের শেষ শাসক _____ ।

(ঙ) তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা _____ ।

৩. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
সালুভ	আয়বিভু
বিরূপাক্ষ	নরসিংহ
তিরুমল	হরিপুর
আমুক্তমাল্যদা	পর্তুগীজ
নুনিজ	কৃষ্ণদেব রায়

৪. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (তিনটি-চারটি বাক্যে) :

(ক) রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকাল সম্পর্কে যা জানো লেখো।

(খ) বিজয়নগর রাজ্যটির সামাজিক জীবনের বর্ণনা দাও।

(গ) বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

নতুন ধর্মীয় ভাবনা : ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ

১০

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মধ্যযুগের ভারতে মানুষের জীবযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মধ্যযুগীয় ভারতের নতুন ধর্মীয় ভাবনা হিসেবে সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের মূল বক্তব্যগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রচলিত ধর্মমত থেকে পৃথক ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মানুষের জীবনযাত্রার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল ধর্ম। ধর্ম হল একধরনের বিশ্বাস, এই বিশ্বাস অনুযায়ী সে তার নিজস্ব ধর্মের দেবতার উপাসনা করে থাকে। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান এই দুটি ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচলিত ছিল। সুলতানি আমলে সমাজে প্রচলিত বর্ণ প্রথা ও ব্রাহ্মণবাদের কড়া নিষেধাজ্ঞা সাধারণ অব্রাহ্মণদের ধর্ম সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করে। এই নতুন চিন্তাচেতনা প্রসূত ফলই হল — 'ভক্তিবাদ' ও 'সুফিবাদ'।

ভক্তিবাদ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে অলভার এবং নায়নার সাধকদের হাত ধরেই ভক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। ভারতবর্ষের নানাদিকে শোনা যেতে থাকে তাঁদের কথা, লেখা, কবিতা এবং গান।

ভক্তিবাদী সাধকের নাম	মূল আদর্শ ও লক্ষ্য
গুরুনানক	• মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা ও সহাবস্থানের আদর্শ স্থাপন • তাঁর সময়ে চালু হয় লঙ্গরখানা • তাঁর দর্শন ও বাণীর ওপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে শিখ ধর্ম
মীরাবাঈ	• পঞ্চদশ শতকে রাজস্থানের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম ও মেওয়ারের শাসককুলে বিবাহ • ভগবান কৃষ্ণের একনিষ্ঠ সাধিকা

ভক্তিবাদী সাধকের নাম	মূল আদর্শ ও লক্ষ্য
	● ভজন ও কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিবাদের প্রচার ● তাঁর রচিত পাঁচশোর বেশি ভক্তিগীতি ভারতীয় সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ
কবীর	● পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক। তার মতাবলম্বীদের কবীরপন্থী বলা হয়ে থাকে ● তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল এক, সব ভগবানই সমান ● তাঁর দর্শন হিন্দু ও মুসলমানদের ভেদাভেদ মেটাতে সাহায্য করেছিল ● তিনি মনে করতেন সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান ● তাঁর রচিত হিন্দি ভাষায় দুই পংক্তির কবিতা হল দোঁহা। এই দোঁহাই ছিল তাঁর ধর্ম প্রচারের মাধ্যম
শ্রীচৈতন্য	● সুলতানি আমলে বাংলার নবদ্বীপে ভক্তিবাদী মতবাদের একমাত্র প্রচারক ● নগরকীর্তনের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন ● ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণবাদের বিরোধিতা করেছিলেন ● প্রচার মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা ● জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের ওপর জোর দিয়েছিলেন

গুরুনানক

মীরাবাঈ

কবীর

শ্রীচৈতন্য

সুফিবাদ

খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল তাকেই সুফিবাদ বলা হয়ে থাকে।

- সুফিবাদের আবির্ভাব হয়েছিল মধ্যএশিয়ায়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে সুফীবাদ ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করে।
- 'সুফি' কথাটি এসেছে 'সুফ' থেকে যার অর্থ পশমের তৈরি এক টুকরো কাপড়। সুফী সাধকরা এই ধরনের কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করতেন।
- সুফিরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, এগুলিকে 'সিলসিলা' বলা হয়।
- সুফি সাধকরা তাদের শিষ্যদের নিয়ে যে আশ্রমে থাকতেন, তাকে 'খানকা' বলা হয়।
- সুফি সাধক ও শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পির বা সাধক গুরুরা তাদের দর্শন, চিন্তা তাদের পছন্দমতো শিষ্যকে দান করে যেতেন।

সুফি মতবাদের মূল দুটি ধারা বা গোষ্ঠী ছিল। দুটি ধারা ও তার বৈশিষ্ট্য নীচে ছকের মাধ্যমে আলোচিত হল —

চিশতি	সুহরাবর্দি
● সুফি মতবাদীদের অন্যতম গোষ্ঠী 'চিশতি'। তাদের বসতি ছিল দিল্লি ও গঙ্গা-যমুনা, দোয়াব অঞ্চলে।	● সুহরাবর্দি গোষ্ঠীর বসতি ছিল সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে। এরা অপর একটি সুফীবাদী গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল।
● প্রতিষ্ঠাতা মইনুদ্দিন চিশতি।	● শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ছিলেন এদের অন্যতম সাধক। এদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বদরউদ্দিন জাকারিয়া।
● চিশতি সাধকদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ ও ক্ষমতার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সব মানুষই তাদের কাছে সমান ছিল।	● এই গোষ্ঠীর সুফি সাধকরা দারিদ্র্যের বদলে আরামের জীবন পছন্দ করতেন। এমনকি উপহার বা দরবারে উচ্চপদ নিতেও তারা সংকোচবোধ করতেন না।
● রাজনীতি ও দরবার থেকে তাঁরা দূরে থাকতেন।	

মনে রাখা জরুরি :

- ভক্তিবাদ হল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসা।
- 'সুফি' কথাটি এসেছে 'সুফ' থেকে, যার অর্থ হল পশমের তৈরি একটুকরো কাপড়।
- সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের মূল বক্তব্যই ছিল ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসাই হল _____।

(খ) শিক ধর্মের প্রবর্তক হলেন _____।

(গ) মীরাবাঈ _____ সাধিকা ছিলেন।

(ঘ) দুই পংক্তির কবিতাকে _____ বলে।

(ঙ) চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন _____ ।

২. সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করো :

(ক) নতুন ধর্মীয় 'চিন্তা চেতনা' প্রসূত ফলই হল — ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ।

(খ) উত্তর ভারতে ভক্তিবাদীরা নায়নার ও আলওয়ার নামে পরিচিত ছিল।

(গ) ভজনের মাধ্যমে ভক্তিবাদের প্রচার করেন।

(ঘ) দোঁহা সংস্কৃতে লেখা।

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) ভক্তিবাদ কাকে বলে? একজন ভক্তিবাদী সাধকের নাম লেখো।

(খ) সুফিবাদ কী?

(গ) শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মের নাম কি? তিনি কোন অঞ্চলে ভক্তিবাদের প্রচার করেছিলেন?

(ঘ) 'সিলসিলা' ও 'খানকা' কি?

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিনটি-চারটি বাক্যে) :

(ক) শিখধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁর ধর্মপ্রচারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(খ) সুফিবাদী মতবাদীরা কটি ভাগে বিভক্ত ছিল? তাদের মত পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

(গ) কবীরের ধর্মনীতি ও মূল আদর্শ সম্পর্কে লেখো।

(ঘ) কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের জন্ম হয়েছিল?

নমুনা প্রশ্নপত্র -২

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) কাকে দিল্লী সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?

(খ) সিজদা ও পাইবস প্রথা কী?

(গ) সিরি শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ঘ) দিল্লি সুলতানরা কেন যুদ্ধ করতেন?

(ঙ) কে, কেন বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন?

(চ) সুলতানি আমলের দুটি বন্দরের নাম লেখো।

(ছ) হরিহর ও বুক্ক কারা?

(জ) আমুক্তমাল্যদ গ্রন্থ কে, কোন ভাষায় রচনা করেন?

(ঝ) ভক্তিবাদ কী?

(ঞ) দোঁহা কী?

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

(খ) চল্লিশচক্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বলবন।

(গ) ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে দুই ধরণের কর আদায় করা হত।

(ঘ) সুলতানি আমলের প্রধান মুদ্রা ছিল রূপোর তঙ্কা।

(ঙ) তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

(চ) দ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন তুলুভ বংশের শাসক।

(ছ) সুফ্ শব্দের অর্থ পশমের তৈরি একটুকরো কাপড়।

(জ) নিজামউদ্দিন আউলিয়া ছিলেন চিশতি গোষ্ঠীর একজন সাধক।

(ঝ) দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন সিকান্দার লোদি।

(ঞ) বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক কৃষ্ণদেব রায়।

৩. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	১১৯১ খ্রিস্টাব্দ
তালিকোটার যুদ্ধ	১১৯২ খ্রিস্টাব্দ
তরাইনের প্রথম যুদ্ধ	১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ	১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ

৪. **সংক্ষেপে লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :**

(ক) সুলতান রাজিয়া কেন বিখ্যাত?

(খ) সুলতানি আমলের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

(গ) সুলতানি আমলের আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে কি জানা যায়?

(ঘ) বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি জানতে পারা যায়?

(ঙ) চিশতি সম্প্রদায় সম্পর্কে কি জান?

মুঘল সাম্রাজ্য

১১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর মুঘল সাম্রাজ্যকে কীভাবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আফগান শাসক শেরশাহ-এর উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- মুঘল সম্রাটদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সময়কাল অনুযায়ী মুঘল সম্রাটদের নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুঘলরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। যদিও খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে তাদের ক্ষমতা কমে যায়। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এবং তুর্কি নেতা তৈমুর লঙ-এর বংশধরদের আমরা সাধারণত মুঘল বলে জানি। এই তৈমুর লঙ যেহেতু উত্তর ভারত আক্রমণ (১৩৯৮ খ্রি.) করেছিলেন, সেহেতু মুঘলরাও মনে করত উত্তর ভারতে তাদের শাসনের অধিকার আছে। এই সূত্রেই তৈমুরের বংশধর জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

একনজরে মুঘল শাসন

প্রধান শাসক	সময়কাল	গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ	উল্লেখযোগ্য কাজ
বাবর	১৫২৬ – ১৫৩০ খ্রি.	● ১৫২৬ খ্রি. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (বাবর ও ইব্রাহিম লোদি) ● ১৫২৭ খ্রি. খানুয়ার যুদ্ধ (বাবর ও সংগ্রাম সিংহ বা রাণা যঙ্গ) ● ১৫২৯ খ্রি. ঘর্ঘরার যুদ্ধ (বাবর ও আফগান)	● তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করে যেতে পারেননি। ● তুর্কি ভাষায় রচিত তাঁর স্মৃতিকথা তুজুক-ই বাবরি বা বাবরনামা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি।
হুমায়ুন	১৫৩০ – ১৫৪০ খ্রি. ১৫৫৫ – ১৫৫৬ খ্রি.	● ১৫৩৯ খ্রি. চৌসার যুদ্ধ (হুমায়ুন ও শের খান বা শেরশাহ) ● ১৫৪০ খ্রি. বিলগ্রামের যুদ্ধ (হুমায়ুন ও শের খান বা শের শাহ)	● হুমায়ুন রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বিহারের আফগান নেতা শের খান বা শেরশাহ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রি.) এবং বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রি.) পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল (১৫৪০ – ১৫৪৫ খ্রি.) করেন। পরবর্তী দশ বছরও (১৫৪৫ – ১৫৫৫ খ্রি.) তাঁর বংশধরেরা দিল্লির সিংহাসন পরিচালনা করেন। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শেরশাহ বেশ কিছু সংস্কার করেন—

- কৃষককে 'পাট্টা' নামে একপ্রকার দলিল দিতেন। এই দলিলের মাধ্যমে কৃষক জমিতে অধিকার পেত। পরিবর্তে কৃষকও সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার কথা স্বীকার করে 'কবুলিয়ত' নামে অন্য একটি দলিলে স্বাক্ষর করে দিতেন।

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে শের শাহ অনেক রাস্তা নির্মাণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাস্তাটি ছিল 'সড়ক-ই-আজম'। বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়া পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে এটি 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত হয়।
- পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করেন।
- ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেন।
- সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থা চালু করেন।
- তিনি সাসারাম ও দিল্লিতে বেশ কয়েকটি সৌধ নির্মাণ করেন।

প্রধান শাসক	সময়কাল	গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ	উল্লেখযোগ্য কাজ
আকবর	১৫৫৬ – ১৬০৫ খ্রি.	● ১৫৫৬ খ্রি. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (আকবর বৈরাম খানের সাহায্যে আফগান নেতা আদিল শাহ-এর প্রধানমন্ত্রী হিমুকে পরাস্ত করেন ● ১৫৬৮ খ্রি. চিতোর দূর্গ দখল (আকবর ও রাজপুত) ● ১৫৭৬ খ্রি. হলদিঘাটির যুদ্ধ (আকবর ও রাণা প্রতাপ)	● মনসবদারী ব্যবস্থা চালু করেন ● সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেন ● ফতেহপুর সিকরি এবং প্রাসাদ, মহল, দরবার তাঁর স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা ● ফতেহপুর সিকরিতে বুলন্দ দরওয়াজা ● ধর্মীয় বিষয় আলোচনার জন্য ফতেহপুর সিকরিতে 'ইবাদৎখানা' নির্মাণ করেন ● 'দীন-ই-ইলাহী' মতাদর্শ প্রবর্তন ● হিন্দুদের উপর থেকে তীর্থকর এবং জিজিয়া কর তুলে নেন
জাহাঙ্গির	১৬০৫ – ১৬২৭ খ্রি.	● তিনি মেবারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পাঠান এবং শেষ পর্যন্ত ১৬১৫ খ্রি. রাণা অমর সিংহকে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন	● তুর্কি ভাষায় তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি' লেখেন ● এই সময় শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে একরকম কারুকার্য করার চল দেখা যায়, তাকে পিয়েত্রা দুরা বলা হয়
শাহজাহান	১৬২৭ – ১৬৫৮ খ্রি.	● ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আহমেদনগর রাজ্যটি মুঘলদের দখলে আসে ● বুন্দেলখন্দের বিদ্রোহ দমন করেন	● তাজমহল, লালকেল্লা, জামি মসজিদ, আগ্রা দূর্গ তাঁর অসাধারণ কীর্তি

ঔরঙ্গজেব	১৬৫৮ – ১৭০৭ খ্রি.	● ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে সোলাপুর দখল ● ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে জাঠ বিদ্রোহ দমন ● ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুর এবং ● ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলকুণ্ডা দখল ● সৎনামি, শিখ বিদ্রোহ দমন ● দাক্ষিণাত্যে চলে একটানা যুদ্ধ	● ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রবর্তন ● লালকেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ ছাড়াও ঔরঙ্গাবাদে তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত বিবি-কা-মকবারা ছিল ঐ সময়ের বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্প

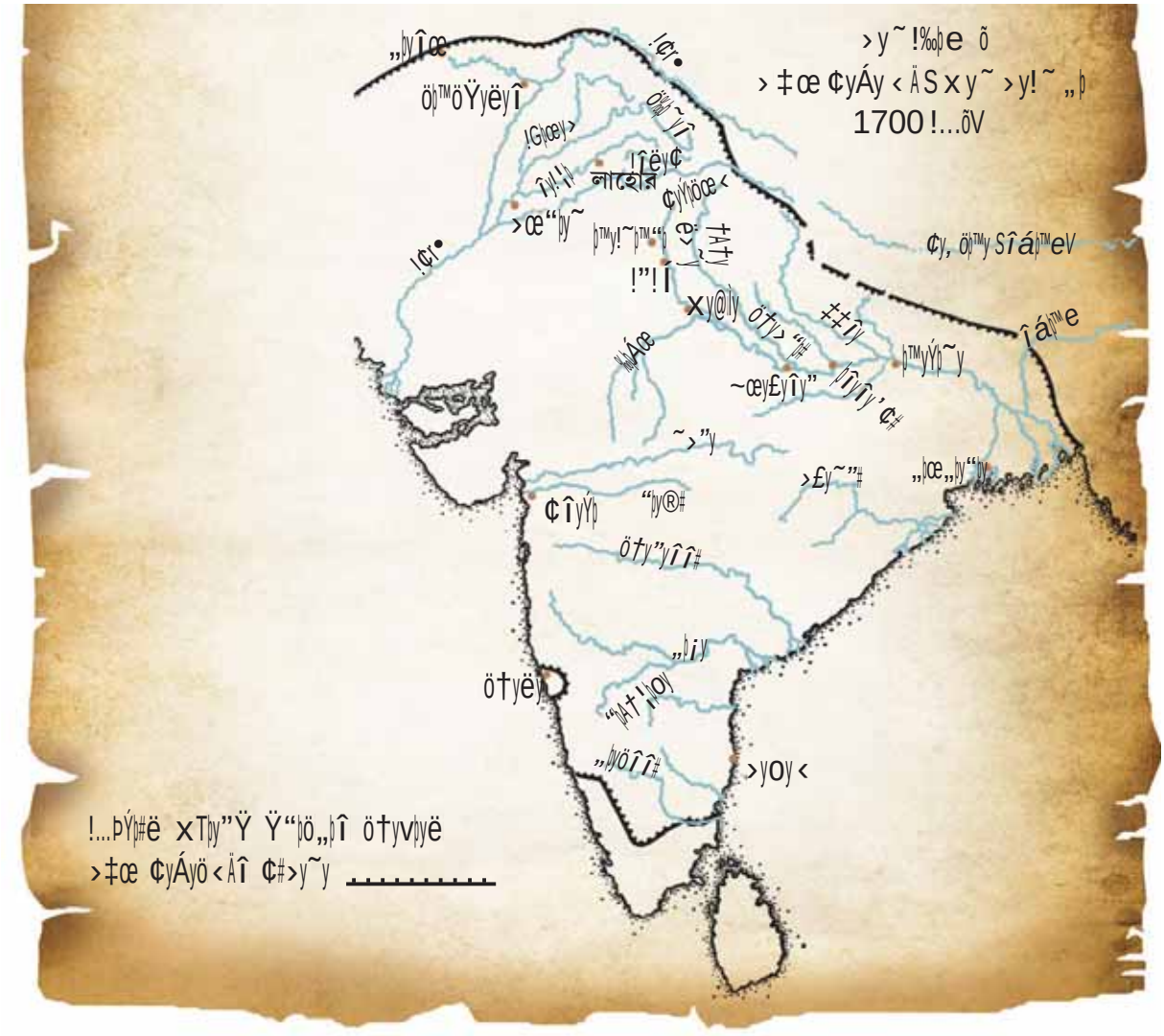

মনে রাখা জরুরি :

- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।
- বাবরের স্মৃতিকথা তুজুই-ই-বাবরি বা বাবরনামা।
- বুলন্দ দরওয়াজা আকবরের সময়ে সৃষ্টি।
- আকবর দীন-ই ইলাহী মতাদর্শ চালু করেন।
- জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'।
- ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়।
- তাজমহল, লালকেল্লা শাহজাহানের অসাধারণ কীর্তি।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) মোঙ্গল নেতা ছিলেন _____।

(খ) খানুয়ার যুদ্ধ হয় _____ খ্রিস্টাব্দে।

(গ) হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন _____।

(ঘ) বুলন্দ দরওয়াজা _____ অবস্থিত।

২. ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :

(ক) ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন শের শাহ।

(খ) হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব।

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়?

(খ) 'বিবি-কা মকবারা' কোন্ মুঘল সম্রাটের আমলে নির্মিত হয়?

৪. রাজত্বকাল অনুযায়ী মুঘল সম্রাটদের নামগুলো পরপর সাজিয়ে লেখো:

আকবর, বাবর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটে বাক্যে) :

(ক) শেরশাহের সংস্কার কাজগুলির পরিচয় দাও।

(খ) আকবরের উল্লেখযোগ্য সংস্কার কাজগুলি সম্পর্কে লেখো।

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

১২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মুঘলদের সঙ্গে মারাঠাদের সংঘাত কেন হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিখদের সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্ব কেন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।
- মুঘল আমলের শেষ দিকে জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মুঘল আমলে মারাঠাদের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলি মুঘলদের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র :

মারাঠারা প্রধানত মহারাষ্ট্রের পুণে ও কোঙ্কন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল। এই মারাঠাদের মধ্যে অনেকেই বিজাপুর ও গোলকোন্ডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিলেন। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজিই (১৬৩০-১৬৮০ খ্রি.) মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি বিজাপুরের বেশ কিছু জমিদারকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজিকে দমন করতে আফজল খানকে পাঠান। উলটে শিবাজি তাঁর বাঘনখ নামক একটি অস্ত্র দিয়ে আফজল খানকেই হত্যা করেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণে শিবাজিকে দমন করতে ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিবাজিকে পুরন্ধরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করিয়ে ২৩টি দূর্গ দখল করেন।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড়োসড়ো প্রতিরোধ আন্দোলন। শিবাজি একটি সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। রায়গড়ে তাঁর অভিষেক হয় (১৬৭৪ খ্রি.)। বলা যায় শিবাজির নেতৃত্বেই মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জেগে উঠেছিল।

শিখ শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র :

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময়ে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেঁধে যেত। ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে তারা বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন শুরু করে। গুর অর্জুনের ছেলে গুরু হরগোবিন্দ একসঙ্গে দুটি তলওয়ার চালিয়ে বোঝাতে চাইতেন শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর আছে। শিখদের এই স্বাধীন উত্থান মুঘলদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ছাড়াও পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করায় মুঘলরা তাঁকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর শিখরা পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকায় চলে যায় এবং সেখানেই দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে খালসা নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। শিখদের নিরাপদে রাখাই ছিল খালসার কাজ। সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল শিখদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের পাঁচটি 'পন্থ' বা পথ ঠিক করে দেন। গুরু তাদের পাঁচটি জিনিস সবসময় কাছে রাখতে বলেন। এই পাঁচটি জিনিস হল—কেশ, কঙ্ঘা (চিরুনি), কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া। খালসাপন্থী শিখরা 'সিংহ' পদবি ব্যবহার করত। গুরু গোবিন্দ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে না পারলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বান্দা বাহাদুর লড়াই চালিয়ে যান।

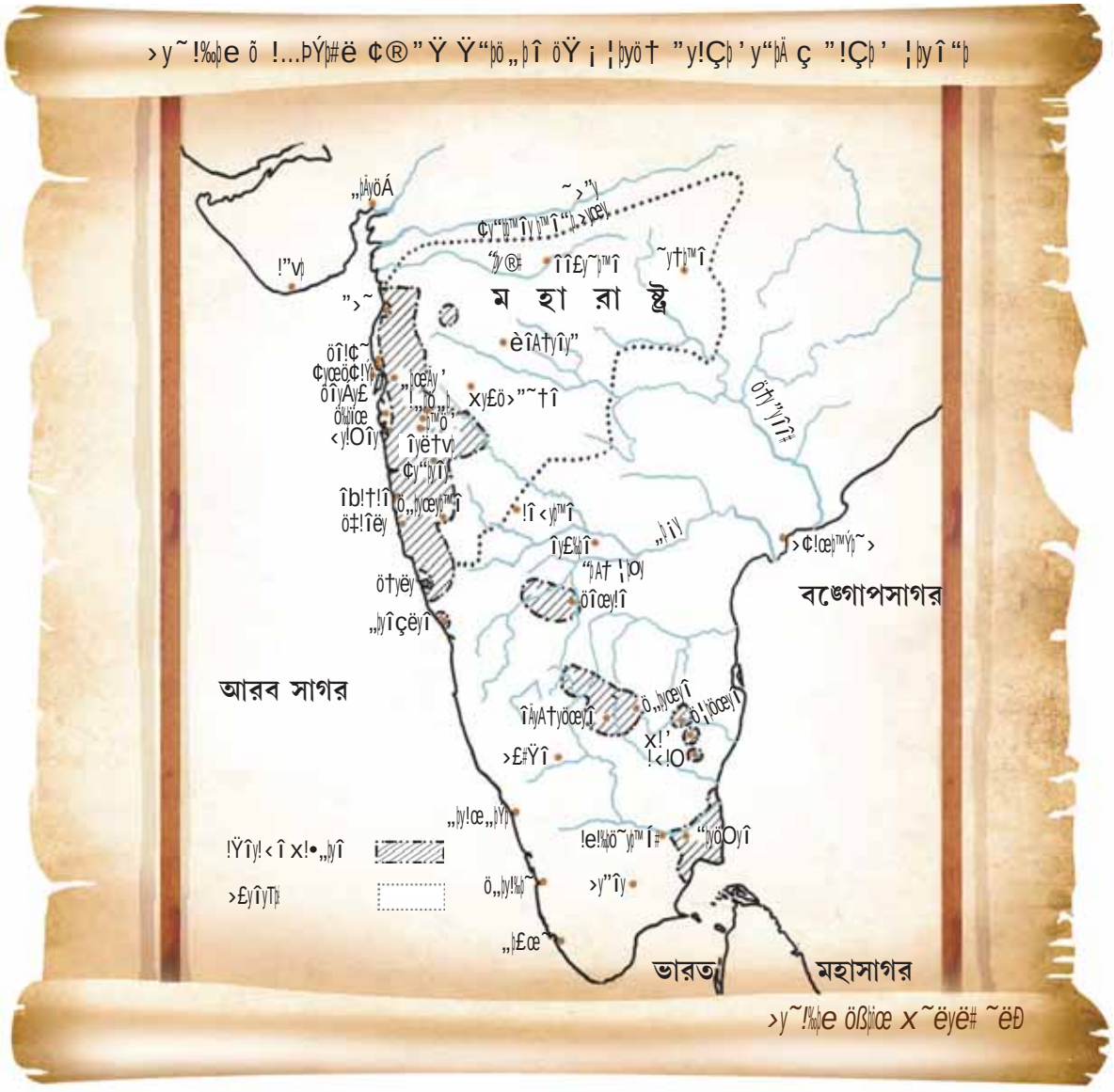

অন্যান্য বিদ্রোহ :

দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের জাঠরা ছিল প্রধানত কৃষক। রাজস্ব দেওয়া নিয়ে জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে তাদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত বাধে। মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। এরা ছিল সৎনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতিরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি ছিল আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন।

জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : আকবরের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হত মনসবদার। মনসবদারদের দুভাবে বেতন দেওয়া হত—নগদে অথবা রাজস্ব বরাত দিয়ে। রাজস্বের এই বরাতকে বলা হত জায়গির।

শাহজাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। মনসবদারদের পদ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই বেতন দেওয়া হত না। কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায়ও ঠিক মতো হত না। এছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হত না। ঔরঙ্গজেবের সময় এই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকটের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে যুগের কৃষি সংকটও। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সব থেকে ভালো জমিগুলি খাস জমি বা খালিসা জমি হিসেবে রেখেছিলেন। সেগুলি জায়গির হিসাবে দেওয়া হত না। খাস জমির রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হত। জায়গির হিসেবে বণ্টনের জন্য এরকম ভালো জমির অভাবও সমস্যাকে আরও জটিল করেছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- মারাঠারা প্রধানত পুণে ও কোঙ্কন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল।
- মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং রাজা জয়সিংহকে পাঠান।
- শিবাজি মারাঠাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করেন।
- শিখরা ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন শুরু করে।
- শিখরা তাদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

নমুনা প্রশ্ন

১. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে _____ সীমান্তে।

(খ) আকবরের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হত _____।

(গ) শিখরা বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন শুরু করে _____ শতকের শেষ দিক থেকে।

(ঘ) শিখদের দশম গুরু ছিলেন _____।

২. **ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) খালসা নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন গুরু গোবিন্দ সিংহ।

(খ) ঔরঙ্গজেব সব থেকে ভালো জমিগুলি খাস জমি বা খালিসা জমি হিসেবে রেখেছিলেন।

(গ) বিজাপুরের সুলতান শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খানকে পাঠান।

(ঙ) শিবাজির অভিষেক হয় প্রতাপগড় দুর্গে।

৩. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :**

(ক) কোথায়, কত খ্রিস্টাব্দে শিবাজির অভিষেক হয়েছিল?

(খ) পুরন্ধরের সন্ধি কত খ্রিস্টাব্দে এবং কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?

(গ) শিখদের নবম গুরু কে ছিলেন?

(ঘ) সৎনামি বিদ্রোহ কোথায় সংগঠিত হয়?

৪. **সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :**

(ক) শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান কীভাবে হয়?

(খ) শিখদের ঐক্যবদ্ধ করতে গুরু গোবিন্দ সিংহের ভূমিকা উল্লেখ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩

১. অতিসংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়েছিল?

(খ) চৌসার যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়?

(গ) 'পাট্টা' কী?

(ঘ) 'কবুলিয়ত' কী?

(ঙ) দীন-ই-ইলাহী কী?

(চ) কবে, কোথায় শিবাজীর অভিষেক হয়েছিল?

(ছ) কবে, কাদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়?

(জ) মনসব কী?

(ঝ) জায়গির কী?

(ঞ) খালসা কী?

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) খানুয়ার যুদ্ধ হয় বাবর ও রাণা সংগ্রাম সিংহের মধ্যে।

(খ) বাবরের আত্মজীবনী তুজুক-ই-বাবরী।

(গ) শিখদের দশম গুরু ছিলেন তেগ বাহাদুর।

(ঘ) খালসাপন্থী শিখরা সিংহ পদবি ব্যবহার করত।

(ঙ) সড়ক-ই-আজম নির্মাণ করেন আকবর।

(চ) সৎনামীরা ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়।

(ছ) লালকেল্লা নির্মাণ করেন শাহজাহান।

(জ) ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানা প্রতিষ্ঠা করেন আকবর।

(ঝ) বিবি কা মকবারা নির্মাণ করেন শাহজাহান।

(ঞ) শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার প্রবর্তন করেন _____।

(খ) খালসা গড়ে তোলেন _____।

(গ) ইবাদৎখানা প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(ঘ) পুরুন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় _____।

(ঙ) ঘোড়ার পিঠে ডাক ব্যবস্থা চালু করেন _____।

৪. **উপযুক্ত তথ্যসহ ছকটি পূরণ করো :**

যুদ্ধ	সময়কাল	বিবাদমান দুটি পক্ষ
ঘর্ঘরার যুদ্ধ		
বিলগ্রামের যুদ্ধ		
পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ		
হলদিঘাটির যুদ্ধ		

পঠন সেতু-র বিষয় প্রসঙ্গে

- অষ্টম শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালটিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অনেকগুলি বিষয়কে নেওয়া হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস আধুনিক যুগ হলেও ষষ্ঠ শ্রেণি (প্রাচীন যুগ) এবং সপ্তম শ্রেণির (মধ্যযুগ) ইতিহাস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সংযোগ রক্ষার জন্য এখানে রাখা হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ভাবনা স্থান পেয়েছে — সংযোগরক্ষাকারী বিষয় ও মৌলিক বিষয়।
- অবশ্য এক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ের সংখ্যাই বেশি।
- ষষ্ঠ শ্রেণির খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক, প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার ইতিহাস, ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নেওয়া হয়েছে।
- সপ্তম শ্রেণির দিল্লি সুলতানি, বিজয়নগর সাম্রাজ্য, নতুন ধর্মীয় ভাবনা, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও এখানে রাখা হয়েছে।
- নমুনা প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের কথা ভেবে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রশ্নের ধরনকে সরাসরি অনুসরণ করা হয়নি।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ভূগোল

অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

অনিন্দিতা দে

বিষয় নির্মাণ

সৌভিক ভট্টাচার্য
সুমন কুমার মাইতি

অম্লান মজুমদার
সুরজিৎ ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	পৃথিবীর গভীরে খোঁজখবর	1
2.	মহাদেশের নড়াচড়া	5
3.	শিলার প্রাথমিক পরিচয়	8
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	11
4.	বায়ু চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহের প্রাথমিক ধারণা	13
5.	মেঘ ও বৃষ্টি	17
6.	পরিবেশের অবনমনে মানুষের ভূমিকা	20
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	25
7.	উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাধারণ পরিচিতি	26
8.	দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	35
	নমুনা প্রশ্নপত্র ৩	45

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 পৃথিবীর গভীরে খোঁজখবর

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- উপাদানের ভিত্তিতে পৃথিবীকে কী কী ভাগে ভাগ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- ভৌত অবস্থার বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগগুলি কেমন তা বর্ণনা করতে পারবে।
- পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

পৃথিবীর এক্স-রে

ধরো, তোমাদের স্কুলের মাঠে একটা গর্ত খোঁড়া শুরু করলে। গর্তটা দিনে দিনে গভীর হতে থাকল। একদিন পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে গেল সেই গর্ত। তখন তার গভীরতা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান, অর্থাৎ প্রায় ৬৪০০ কিমি। এরপরেও গর্ত খোঁড়া চললে আরো এক ব্যাসার্ধ পরিমাণ গভীরতা বৃদ্ধির পর কী হবে? আমরা উল্টোদিকের ভূপৃষ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ব। আমাদের গর্তটা পৃথিবীকে এফোঁড়-ওফোঁড় করা একটা সুড়ঙ্গে পরিণত হবে।

এই সুড়ঙ্গটার দেওয়াল পরীক্ষা করতে গেলেই আমরা জেনে যেতাম পৃথিবীর ভিতরটা কী কী শিলা দিয়ে তৈরি আর সেগুলো কেমন অবস্থায় আছে।

এইরকম একটা চেষ্টা রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপে এক সময় হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১২ কিমি খুঁড়বার পর এত শক্ত পাথর বেরিয়ে পড়ে যে, সেই গবেষণা বন্ধ করে দিতে হয়। আমেরিকার মোহোল গর্ত খুঁড়বার উদ্যোগও সফল হয়নি। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি, বাস্তবে খুব গভীর গর্ত খোঁড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে পৃথিবীর ভিতরটা কেমন, আমরা কীভাবে জানলাম? এই ব্যাপারে কাজে লেগেছে ভূমিকম্প তরঙ্গ। ভূগর্ভের যেখানে ভূমিকম্প ঘটে সেখান থেকে বিভিন্ন কম্পন তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলিকেই বলে **ভূমিকম্প তরঙ্গ**। বিভিন্ন ধরনের ভূমিকম্প তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন গভীরতায় কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে অগ্রসর হয়। দ্রুত গেলে সময় কম লাগে, ধীরে গেলে বেশি। পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে ঐসব তরঙ্গের উপস্থিতি মেপে, তা থেকে নানারকম অঙ্ক কষে আমরা এখন পৃথিবীর ভেতরে কোথায় কী আছে, তা যথেষ্ট নিখুঁতভাবে জানতে পেরেছি সেখানে না গিয়েই!

ভূমিকম্প তরঙ্গগুলো যেন পৃথিবীর একটা এক্স-রে ছবি আমাদের উপহার দিয়েছে। ভূবিজ্ঞানীরা যেন ডাক্তারের মতোই সেই ছবি দেখে বলে দিচ্ছেন, পৃথিবীর ভিতরে কোথায় কী স্তর এবং সেগুলোতে কী পরিবর্তন ঘটছে!

তাপ আর চাপের লড়াই স্তরগুলি সেইভাবে পাই

পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রা তত বাড়বে। প্রতি ৩৩ মিটার গভীরতায় মোটামুটি ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে। পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে অধিকাংশ কঠিন পদার্থ আয়তনে বাড়ে ও তরল হয়ে যায়। অন্যদিকে, চাপ বৃদ্ধি পেলে অধিকাংশ তরল পদার্থ আবার আয়তনে সঙ্কুচিত হয়, কঠিন হয়ে যেতে চায়। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর গভীরে গেলে তাপমাত্রা যেমন বাড়বে, চাপও বৃদ্ধি পেতে থাকবে যথেষ্ট পরিমাণে। ফলে চাপ ও তাপের মধ্যে যেন একটা লড়াই শুরু হবে। চাপের জন্য পদার্থ জমাট কঠিন হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু তাপের জন্য তা হতে চাইবে তরল। এইভাবে অতি উচ্চ চাপ ও তাপের প্রভাবে পদার্থ এক অদ্ভুত চরিত্র লাভ করে। বস্তু তখন প্রথমে কঠিন থেকেও কিছুটা যেন তরলের মতো আচরণ করে। আবার, পৃথিবীর একেবারে গভীরে চাপ এতই বেশি যে সমস্ত পদার্থ সেখানে হয়ে আছে অত্যন্ত ঘন ও কঠিন।

পৃথিবীর গভীরে বেশিরভাগ অংশেই অতি উচ্চ চাপে স্তরগুলি জমাট কঠিন হয়ে আছে। দুএকটি স্থানে তা তরল এবং অর্ধতরল। তোমরা জানো কঠিন, তরল, গ্যাসীয় — এইগুলি হলো পদার্থের ভৌত অবস্থা। তাই বলা যায়, ভৌত অবস্থার বিচারে, অর্থাৎ কঠিন না তরল — সেই অবস্থার বিচারে পৃথিবীর অভ্যন্তরের একটি শ্রেণিবিভাজন সম্ভব। আরেকটি বিভাজন সম্ভব রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে।

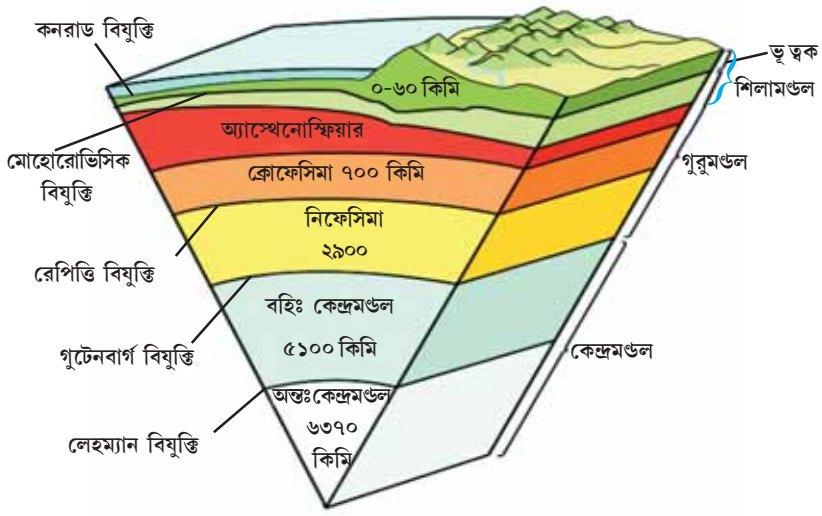

পৃথিবীর অভ্যন্তর

রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তর বিভাজন

প্রধানত সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) নিয়ে মহাদেশীয় ভূত্বক (Sial) এবং প্রধানত সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেশিয়াম (Mg) নিয়ে গঠিত মহাসাগরীয় ভূত্বক (Sima) সৃষ্টি হয়েছে । এই ভূত্বক এবং গুরুমণ্ডলের সবথেকে উপরের কঠিন অংশ নিয়ে শিলামণ্ডল গঠিত হয়েছে। এর নীচে ক্রোমিয়াম (Cr), লোহা (Fe), সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে তৈরি হয়েছে ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল (Crofesima) এবং তার নীচে নিকেল (Ni), লোহা, সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম গঠিত নিম্ন গুরুমণ্ডল (Nifesima)। সবচেয়ে গভীরে রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল (Nife) যা শুধু নিকেল ও লোহা দিয়ে তৈরি। এই কেন্দ্রমণ্ডল আবার বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল ও অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল — এই দুটি ভাগে বিভক্ত। উপাদানের ভিত্তিতে যে স্তরবিভাজন, তাতে একটা বিষয় লক্ষ করো। ওপরের দিকে আছে সিলিকন আর নীচের দিকে লোহা-নিকেল। সিলিকন অনেক হাল্কা, তাই রয়েছে ওপরে আর ভারী বলেই বেশিরভাগ লোহা - নিকেল তলিয়ে গেছে নীচে। পৃথিবীর গলিত অবস্থায় থাকার সময়েই এই ঘটনা ঘটেছিল।

বিভিন্ন বিযুক্তি

দুটো স্তর আলাদা করে দেওয়া তলগুলো যেসব বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, তাঁদের নামেই সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, জোসেফ কনরাড-এর নামে কনরাড বিযুক্তি, আন্দ্রেয়া মোহোরোভিসিক-এর নামে মোহো বিযুক্তি, উইলিয়াম রেপিত্তি-এর নামে রেপিত্তি বিযুক্তি, ইঙ্গে লেহম্যান-এর নামে লেহম্যান বিযুক্তি, বেনো গুটেনবার্গের নামে গুটেনবার্গ বিযুক্তি। এঁরা সব শ্রদ্ধেয় ভূতত্ত্ববিদ — এঁদের জীবনী ও কাজের কথা তোমরা পরে আরো জানতে পারবে।

✸ **নীচের চিত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তর ও বিযুক্তি চিহ্নিত করো। তারপর শূন্যস্থান পূরণ করো।**

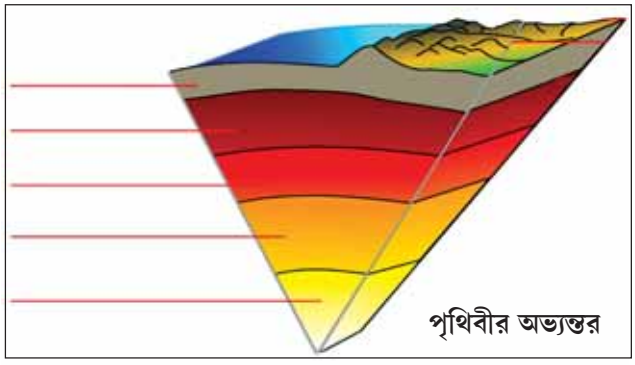

- একটু ভেবে বলো M বিযুক্তি নামে অতি সংক্ষেপে কোন বিযুক্তিটিকে চিহ্নিত করা যায়?

জেনে রাখো

বিভিন্ন সামাজিক বাধার জন্য একুশ শতকেও বিজ্ঞানচর্চায় মহিলাদের অংশগ্রহণ কম। ভূবিজ্ঞানে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ইঙ্গে লেহ্ম্যানের ভূমিকা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে এক চরম উদাহরণ। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে তিনি তরল বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরে কঠিন অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল চিহ্নিতকরণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেইজন্য এই বিযুক্তিটি তাঁর নামেই চিহ্নিত। ১৯৯৩ সালে ১০৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তোমরা জানো, বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে লোহায় চৌম্বকত্বের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর তরল বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলে প্রচুর লোহা ও নিকেল ঘুরতে ঘুরতে বিদ্যুৎক্ষেত্র তৈরি করে চলেছে। এর ফলেই পৃথিবীর চৌম্বক ধর্মের উদ্ভব। যদি বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর চৌম্বকত্বও নষ্ট হয়ে যাবে।

মনে রাখা জরুরি :

- **ভূত্বক** — মহাদেশীয় ত্বক (Sial) ও মহাসাগরীয় ত্বক (Sima) এর মিলিত নাম।
- **শিলামণ্ডল** — পৃথিবীর ওপরের কঠিন অংশ যা Sial, Sima ও ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল বা Crofesima এর কঠিন অংশ-এর মিলিত নাম।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'পৃথিবীর অন্দরমহল' অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১. অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল ও বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের মাঝের বিযুক্তি যাঁর নামে চিহ্নিত তিনি হলেন —

(ক) কনরাড (খ) মোহো (গ) লেহম্যান (ঘ) গুটেনবার্গ।

১.২ মহাসাগরীয় ভূত্বক হলো —

(ক) Sial (খ) Sima (গ) Crofesima (ঘ) Nifesima.

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানা গেছে _____ তরঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

২.১.২ লোহা সবথেকে বেশি আছে পৃথিবীর _____ মণ্ডলে।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল অর্ধতরল অবস্থায় আছে।

২.২.২ পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রধান স্তর তিনটি।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
২.৩.১	M বিযুক্তি	১. মহাদেশ ও মহাসাগর
২.৩.২	ভূত্বক	২. বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল
২.৩.৩	পৃথিবীর চৌম্বকত্ব	৩. Sial + Sima
২.৩.৪	সিলিকন	৪. বিজ্ঞানী আন্দ্রেয়া মোহোরোভিসিক

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ পৃথিবীর সবচেয়ে অভ্যন্তরের স্তর কোনটি?

২.৪.২ পৃথিবীর গভীরতা কত কিলোমিটার?

৩. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৩.১ বিযুক্তি বলতে কী বোঝো? একটি উদাহরণ দাও।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ ভূত্বক ও শিলামণ্ডলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪.২ উপাদানের ভিত্তিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের একটি চিহ্নিত চিত্র আঁকো।

2 মহাদেশের নড়াচড়া

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পৃথিবীর মহাদেশগুলি পাতের অংশ হিসেবে কীভাবে নড়াচড়া করছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
- শিলামণ্ডলের পাতগুলি কেন অস্থির তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুটি পাতের সংঘর্ষে কীভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

চলমান মহাদেশ

পৃথিবীর মানচিত্রে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ পাশাপাশি, মাঝখানে আটলান্টিক মহাসাগর। অনেকদিন থেকেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলতেন, মহাদেশ দুটোর মুখোমুখি উপকূলে খুব মিল; যেন একটা এলোমেলোভাবে ছেঁড়া কাগজ দুদিকে সরিয়ে দেওয়া আছে, কাছে আনলেই খাঁজে খাঁজে জুড়ে যাবে।

অনেক পুরনো দিনের জলবায়ুর চিহ্ন মাটিতে, পাথরে বহুদিন থেকে যায়। সেইসব নিয়ে গবেষণা করতেন বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার। তিনি বিভিন্ন স্থানের পাথরে কিছু অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পেলেন। যেমন — বিশেষ কিছু প্রাণীর মৃতদেহের ছাপ পাথরের ভেতর (জীবাশ্ম), অনেকগুলো মহাদেশে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রাণী সবধরনের জলবায়ুতে থাকতে পারে না। শীতের দেশের কয়লাখনিগুলোতে তিনি দেখলেন, যে সব গাছ থেকে কয়লা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো গরমের দেশ ছাড়া জন্মায় না। আবার যেখানে কখনো তুষারপাত হয় না, সেইসব গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পাথরে রয়েছে বরফের ঘষা-লাগার চিহ্ন। আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের আকৃতিতেই শুধু মিল নেই— পাথরের ধরন আর বয়সেও রয়েছে হুবহু সাদৃশ্য। বিভিন্ন হিসেব করে ১৯১২ সালে তিনি বললেন, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেত্রিশ কোটি বছর আগে কার্বনিফেরাস যুগের শেষদিকে সবকটা মহাদেশ একত্রিত ছিল। সেই মহা-মহাদেশের নাম প্যানজিয়া। তারপর মোটামুটি কুড়ি কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক যুগের শেষে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে নানাদিকে সরে যেতে শুরু করে। সেইগুলোই আজকের মহাদেশ। কিন্তু মহাদেশ সঞ্চরণের এই ভাবনা সেই সময় প্রায় কোনো বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেননি।

সরতে থাকা মেঝে

১৯৫০ সালের পর থেকে সমুদ্রের মেঝে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়তে শুরু করল। নানা রহস্যময় তথ্য পেয়ে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শেষে ১৯৬০ সালে হ্যারি হেস ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকটা সমুদ্রের মেঝে তাদের মাঝামাঝি একটা অবস্থান থেকে দুই বিপরীত দিকে দুই মহাদেশের দিকে সরে সরে যাচ্ছে এবং শেষে মহাদেশের উপকূলের কাছেই বেঁকে গভীর ভূগর্ভে প্রবেশ করছে। মাঝখানে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে প্রচুর ম্যাগমা বেরিয়ে আসছে, তৈরি হচ্ছে আগ্নেয় পর্বত। অন্য প্রান্তে ভূগর্ভে ঢুকে যাওয়া সমুদ্রের মেঝে গলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে অর্ধগলিত পদার্থের ভিতরেই। কিন্তু এই ভাবনাতেও সমস্যা ছিল।

‘পাত’ ভাবনার অবদান সব সমস্যার সমাধান

উইলসন, ম্যাকেঞ্জি, পার্কার, পিচোঁ প্রমুখ বিজ্ঞানী ১৯৬৮ সালে নতুন একটা ধারণা নিয়ে এলেন। ‘পাত বা Plate’, যা কিনা একটা মহাদেশ আর তার পাশের সমুদ্রের মেঝের খানিকটা একসাথে নিয়ে তৈরি। এর সমুদ্রের মেঝের দিকটা পাতলা, তার নাম ‘মহাসাগরীয় সীমানা’, আর মহাদেশের দিকটা অনেক পুরু তাকে বলা হলো ‘মহাদেশীয় সীমানা।’

শিলামণ্ডল বড়ো আকারের মোট সাতটা পাতের টুকরো দিয়ে তৈরি হয়েছে। টুকরোগুলো যেন খাঁজে খাঁজে এঁটে আছে। পৃথিবীতে এই খণ্ড বা পাতগুলো আবার পাশাপাশি নড়াচড়া করছে। ফলে —

- দুটো পাত পাশাপাশি দূরে সরে যেতে পারে। এতে ভিতরের উত্তপ্ত পদার্থ লাভা হিসেবে অনবরত বেরোতে থাকবে আর ফাটল বরাবর আগ্নেয়গিরি তৈরি হবে। সমুদ্রের মাঝখানগুলোতে সেটাই হচ্ছে।
- দুটো পাত পরস্পর ঘর্ষণের মাধ্যমে পাশাপাশি চলতে পারে। ঘর্ষণের জন্য এতে ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে।
- দুটো পাত পরস্পর সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। এটা আবার তিনটে আলাদা ধরনের হতে পারে।

(ক) একটি মহাদেশীয় পাতের সাথে আরেকটি মহাদেশীয় পাতের সংঘর্ষ। এতে একটি পাত সীমানা অন্য একটি পাত সীমানার নীচে প্রবেশ করে।

(খ) মহাদেশীয় একটি পাতের সাথে একটি মহাসাগরীয় পাতের সংঘর্ষ। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভারী মহাসাগরীয় পাত অপেক্ষাকৃত হালকা মহাদেশীয় পাতের নীচে প্রবেশ করে।

(গ) দুটি মহাসাগরীয় পাত পরস্পর সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভারী পাতটি হালকা পাতের নীচে প্রবেশ করে। নীচের চিত্রগুলি থেকে পুরো বিষয়টি বুঝে নাও।

মহাদেশীয়-মহাদেশীয় পাত সংঘর্ষ

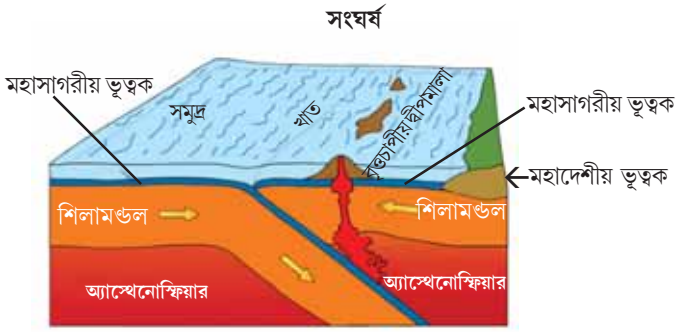

মহসাগরীয়-মহাসাগরীয় পাত সংঘর্ষ

এইসব ঘটনা খুব ধীরে হলেও লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে। এর নাম **'পাত সঞ্চরণ'**। ফলে আমরা কোথাও দেখি হিমালয়ের মতো ভঙ্গিল পর্বতমালার জন্ম হচ্ছে, কোথাও দেখছি ধনুকের মতো বাঁকানো জাপান দ্বীপপুঞ্জ জেগে উঠেছে, কোথাও সমুদ্রের নীচে ডুবে রয়েছে সুদীর্ঘ আগ্নেয় পর্বতমালা। সাথে চলছে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুদগমের মতো দুর্যোগ।

✷ নীচের চিত্রে দুই ধরনের পাত সীমানা চিহ্নিত করো। দুটি পাত সীমানা বরাবর কী ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে তা উল্লেখ করো।

মনে রাখা জরুরি :

- **প্যানজিয়া** — অতীতে যখন সবকটি মহাদেশ একত্রিত অবস্থায় ছিল, তার নাম।
- **'পাত'** — মহাদেশ ও কিছুটা সমুদ্রের মেঝে একসাথে বিবেচনা করে শিলামণ্ডলের এক-একটি খণ্ড। এরা স্বাধীনভাবে পাশাপাশি নড়াচড়া করে।
- **মহাদেশীয় পাত সীমানা** — পাত সীমানার যে অংশ মহাদেশীয় ভূত্বক নিয়ে গঠিত, যথেষ্ট পুরু, কিন্তু হালকা।
- **মহাসাগরীয় পাত সীমানা** — পাত সীমানার যে অংশ মহাসাগরীয় ভূত্বক নিয়ে গঠিত, অনেক পাতলা, কিন্তু ভারী।

তোমরা অষ্টম শ্রেণির 'অস্থিত পৃথিবী' অধ্যায়ে পাত সম্পর্কিত নানা রকম তথ্য, ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ মহাদেশ সঞ্চরণ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যে বিজ্ঞানী, তাঁর নাম—

(ক) ওয়েগনার (খ) হেস (গ) উইলসন (ঘ) মর্গ্যান।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পাত সঞ্চরণের ফলে সৃষ্ট একটি ভঙ্গিল পর্বতমালার উদাহরণ হলো _____ ।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ সমুদ্রের মেঝেগুলি যে চলমান অবস্থায় আছে, তা প্রথম বলেন বিজ্ঞানী হ্যারি হেস।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ বিজ্ঞানী ওয়েগনার কত সালে তাঁর মহাদেশ সঞ্চরণ তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৩.১ পাত কাকে বলে?

৩.২ পাত সীমানা বরাবর তিনপ্রকার সংঘর্ষের ধরন ব্যাখ্যা করো।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ পাত সঞ্চরণ তত্ত্বের মূল ভাবনাটি সংক্ষেপে লেখো।

3 শিলার প্রাথমিক পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- শিলার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- বিভিন্ন শিলার বর্ণনা করতে পারবে।
- শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করে গাঙ্গেয় সমভূমিতে। এর একটি প্রধান কারণ এখানকার অত্যন্ত উর্বর মাটি। এই মাটিতে প্রায় সব রকমের ফসল ফলানো যায়। আবার যেখানে মাটি উর্বর নয় সেখানে জনসংখ্যাও কম। এতরকমের মাটি এল কোথা থেকে? মাটি তৈরি হয় শিলা থেকে। মাটি যেমন অনেক প্রকার, তেমনই শিলাও অনেক প্রকারের। এক-একটি শিলা বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি, যা আবার নানান মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। ফলে এগুলির গঠন প্রক্রিয়াও ভিন্ন।

আমরা যে ভূত্বকের উপর বসবাস করি, তা কঠিন হলেও ভূগর্ভ প্রচন্ড তাপে কোথাও কোথাও গলিত অবস্থায় রয়েছে। এই গলিত শিলাকে বলে ম্যাগমা। যখন এই ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে লাভারূপে বেরিয়ে এসে বা ভূগর্ভেই কঠিন হয়ে জমাটবদ্ধ হয় তখন তৈরি হয় **প্রাথমিক শিলা** বা **আগ্নেয় শিলা**। একে প্রাথমিক শিলা বলা হয় কারণ ভূত্বক গঠিত হয়েছে এভাবেই। গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট হলো আগ্নেয় শিলার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ।

অগ্ন্যুৎপাত

গ্রানাইট

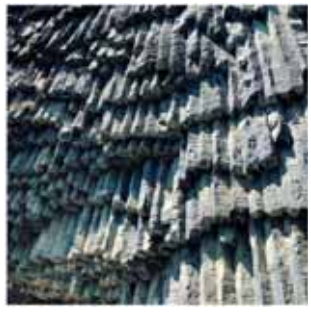

ব্যাসল্ট

ব্যাসল্টে খোদাই অজন্তা গুহা

সব প্রকার শিলা আগ্নেয় শিলা থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। যেমন — আগ্নেয় শিলা ভেঙে, ক্রমশ ছোট ও মিহি হয়ে মাটিতে পরিণত হয়, যা স্তরে স্তরে জমা পড়ে কঠিন হয়ে পাললিক শিলায় পরিণত হয়। বেলেপাথর ও চুনাপাথর পাললিক শিলার দুটি আদর্শ উদাহরণ।

পাললিক শিলার স্তরায়ন

পাললিক শিলায় তৈরি জয়সলমির দুর্গ

আবার আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূগর্ভস্থ চাপ ও তাপে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন শিলায় পরিণত হয়, যাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। কালক্রমে রূপান্তরিত শিলাও আবার রূপান্তরিত হতে পারে। আমরা যত ধরনের রূপান্তরিত শিলা দেখি তার মধ্যে মার্বেল ও স্লেট সবচেয়ে পরিচিত।

মার্বেল পাথর

মার্বেল পাথরে তৈরি তাজমহল

আগ্নেয় শিলা প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে, ফলে অন্যান্য শিলাও তৈরি হয়ে চলেছে। আগ্নেয় শিলা ক্ষয় হয়ে পাললিক শিলা তৈরি হয় যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে ম্যাগমায় পরিবর্তিত হয়ে আবার আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়। শুধু পাললিক শিলা নয়, সব শিলাই কালক্রমে এভাবে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হবে।

প্রকৃতিতে শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বুঝতে পারিনা কোনটা শিলা আর কোনটা খনিজ। সাধারণত যেকোনো শিলা বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, তারা গঠন করে নানান ধরনের ভূমিরূপ। প্রকৃতিতে খনিজ, শিলার মধ্যে অবস্থান করে ও কোনো বিশাল ভূমিরূপ গঠন করেনা। খনিজের সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ও জ্যামিতিক আকৃতি থাকে। খনিজের মধ্যে অন্যতম সহজলভ্য কোয়ার্টজ, যা সিলিকন ও অক্সিজেন — এই দুটি মৌল দিয়ে তৈরি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বালি দেখি, তা আসলে কোয়ার্টজের দানা।

কোয়ার্টজ

ফেল্ডসপার

হিরে

ক্যালসাইট

কোয়ার্টজ ছাড়াও রয়েছে ফেল্ডসপার, এবং এটি অস্বচ্ছ প্রকৃতির। আবার তোমরা স্কুলে চক বা খড়ি দেখো, তা আসলে ক্যালসাইট নামক খনিজে তৈরি। এই সব খনিজ পদার্থ শিলার সঙ্গে ক্ষয়ে মাটি তৈরি হয় ও মাটি বিভিন্ন মৌলসমৃদ্ধ হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- **খনিজ** — কয়েকটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে সৃষ্ট প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ যার নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ও জ্যামিতিক আকৃতি আছে।
- **শিলা** — এক বা একাধিক খনিজ পদার্থ মিলিত হয়ে সৃষ্ট কঠিন পদার্থ।

তোমরা শিলা ও খনিজ পদার্থের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণির 'শিলা' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে তৈরি হয় —

(ক) খনিজ (খ) শিলা (গ) মাটি (ঘ) মৌল।

১.২ আগ্নেয় শিলার একটি উদাহরণ হলো —

(ক) বেলেপাথর (খ) চুনাপাথর (গ) মার্বেল (ঘ) ব্যাসল্ট।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১লাভা জমাটবদ্ধ হয়ে _____ শিলা তৈরি হয়।

২.১.২বালি প্রধানত _____ দ্বারা গঠিত।

২.২. বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.১.১তাজমহল তৈরি হয়েছে মার্বেল শিলা দিয়ে।

২.১.২সিলিকন একপ্রকার মৌল।

২.৩. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ চক খড়ি	১. পলিমাটি
২.৩.২ গ্রানাইট	২. রূপান্তরিত শিলা
২.৩.৩ গাঙ্গেয় সমভূমি	৩. ক্যালসাইট
২.৩.৪ স্লেট	৪. আগ্নেয় শিলা

২.৪. একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ প্রাথমিক শিলা কাকে বলে?

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ ম্যাগমা ও লাভার মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ পাললিক শিলা কীভাবে তৈরি হয়?

৫. নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের ভৌত অবস্থা —

(ক) কঠিন (খ) তরল (গ) অর্ধতরল (ঘ) গ্যাসীয়।

১.২ পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রধান স্তর হলো —

(ক) দুটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি।

১.৩ পাত সঞ্চরণের ফলে যে দুর্যোগ ঘটে না, তা হলো —

(ক) ভূমিকম্প (খ) অগ্ন্যুৎপাত (গ) ধ্বস (ঘ) ঘূর্ণিঝড়।

১.৪ 'মহাসাগরের মেঝেগুলি চলমান' - এই কথা যে বিজ্ঞানী প্রথম বলেন তাঁর নাম —

(ক) ওয়েগনার (খ) মর্গ্যান (গ) হেস (ঘ) উইলসন।

1.5 œy¦þy ‹›yÝþîå• £öë ¢!Tþ £ë ôôô

S„þV ›yöîœ S…V îÄy¢îÝþ S†V öîöœþ™yíî S‡V öÜÚÝþÐ

1.6 ›!_„þyî ßþî þ™î þ™î ¢!Mþ“þ £öë ÷“þ!î £ö“þ þ™yöîô ôôô

S„þV …!˜‹ þ™”yí S…V xyö@þë !Ÿœy S†V þ™yœ!œ„þ !Ÿœy S‡V îþ™ysþ!î“þ !ŸœyÐ

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ সিয়াল ও সিমাকে একত্রে ______________ বলে।

২.১.২ নিকেল ও লোহা সবথেকে বেশি আছে যে স্তরে, তার নাম ______________ ।

২.১.৩ বর্তমানে পৃথিবীতে প্রধান পাতের সংখ্যা ______________ ।

২.১.৪ মহাদেশীয় পাত - মহাসাগরীয় পাত সংঘর্ষে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ______________ পাত।

2.1.5 ²ýí!›„þ !Ÿœy îœy £ë ______________!Ÿœyö„þÐ

2.1.6 !£öî £öœy ~„þ²ì„þyî ______________Ð

2.1.7 öîyövþ öë ‰þ„þ !”öë öœ…y £ë “þy xy¢öœ ~„þ²ì„þyî ________ Ð

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ মহাসাগরীয় ভূত্বক সংক্ষেপে Sima নামে পরিচিত।

২.২.২ ভূমিকম্প তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা জানা গেছে।

২.২.৩ দুটি পাত ঘর্ষণসহ পাশাপাশি চলমান হলে পাত সীমান্তে প্রচুর ভূমিকম্প হবে।

২.২.৪ সমুদ্রের মেঝে মধ্যভাগ থেকে দুইদিকে দুই মহাদেশের দিকে সরে যাচ্ছে।

2.2.5 îy!œî ›œ vþ™y”y˜ £öœy ö„þyëÝþ‹Ð

২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :

	‘ক’ স্তম্ভ	**‘খ’ স্তম্ভ**
২.৩.১	সকল মহাদেশের সমষ্টি	১. গুটেনবার্গ বিযুক্তি
২.৩.২	অর্ধতরল	২. পাত সঞ্চরণ
২.৩.৩	ভূঅভ্যন্তর	৩. প্যানজিয়া
২.৩.৪	অগ্ন্যুৎপাত	৪. অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ পৃথিবীর চৌম্বকত্বের জন্য ভূঅভ্যন্তরের কোন স্তরটি দায়ী?

২.৪.২ ‘মহাদেশগুলি চলমান’— এই তথ্য মহাদেশ সঞ্চরণতত্ত্বের মাধ্যমে প্রথম কে প্রস্তাব করেছিলেন?

২.৪.৩ যে পাত সীমান্ত যথেষ্ট পুরু ও মহাদেশ দিয়ে তৈরি তার নাম কী?

২.৪.৪ “þy‹›£œ ö„þy˜ !Ÿœy !”öë ÷“þ!îÚ

2.4.5 †yöA†ë ¢›¦þ!›ö“þ „þ# ²ì„þyî ›!_„þy þ™yçëy ëyëÚ

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ ভূত্বকে সিলিকন বেশি পরিমাণে রয়েছে কেন?

৩.২ পৃথিবীর চৌম্বকত্ব কীভাবে চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে?

৩.৩ পাত কাকে বলে?

৩.৪ সমুদ্রের জলের নীচে অগ্ন্যুৎপাত হয় কেন?

3.5 öšþÓþ¢þ™yöîî ~„þ!Ýþ ÷î!ŸTþÄ vþöÍ… „þöîyÐ

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ ভূত্বক ও শিলামণ্ডলের মধ্যে পার্থক্য ছবিসহ ব্যাখা করো।

৪.২ পৃথিবীর অভ্যন্তরে পদার্থের অবস্থা খানিকটা প্লাজমার মতো কেন?

৪.৩ ওয়েগনার মহাদেশ সঞ্চরণের যেসব প্রমাণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করো।

৪.৪ মহাদেশীয় পাতসীমানা ও মহাসাগরীয় পাতসীমানার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

4.5 …!˜‹ ç ö›ï!œ„þ þ™”yöíî ›ö•Ä þ™yí„þÄ „þ#Ú

4.6 !Ÿœy „þë ²ì„þyî ç „þ# „þ#Ú ²ìö“þÄ„þ!Ýþî ~„þ!Ýþ „þöî ÷î!ŸTþÄ vþöÍ… „þöîyÐ

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ ভৌত অবস্থার ভিত্তিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন একটি চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৫.২ পাত সঞ্চরণের ফলে কত প্রকার সংঘর্ষ হতে পারে—চিহ্নিত চিত্র এঁকে বিশ্লেষণ করো।

৫.৩ পাত সঞ্চরণের মূল ভাবনাটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

4 বায়ু চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহের প্রাথমিক ধারণা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বায়ু চাপবলয় ও বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে এবং তার কারণ আমাদের ঘিরে রয়েছে এমন একটি গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমণ্ডল যাতে প্রাণ ধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক মাত্রায় রয়েছে। উপাদানগুলির সঠিক বণ্টন হয়েছে সূর্য থেকে পৃথিবীর সঠিক দূরত্বে অবস্থানের জন্য। পৃথিবীতে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি সূর্য। সূর্যের তাপে কোনো স্থানের বায়ু উত্তপ্ত ও হাল্কা হয়ে উপরে উঠতে থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের উপর যে চাপ দেয় তা কমতে থাকে। এই অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। এই বায়ুশূন্য স্থানটিকে ভরাট করতে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। যেখানে বায়ুর ঘনত্ব বেশি সেখানে বায়ু ভারী। ফলে সেই বায়ু নিম্নগামী হয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর বেশি চাপ দেয় এবং এখান থেকেই বায়ু চারদিকে প্রবাহিত হয়।

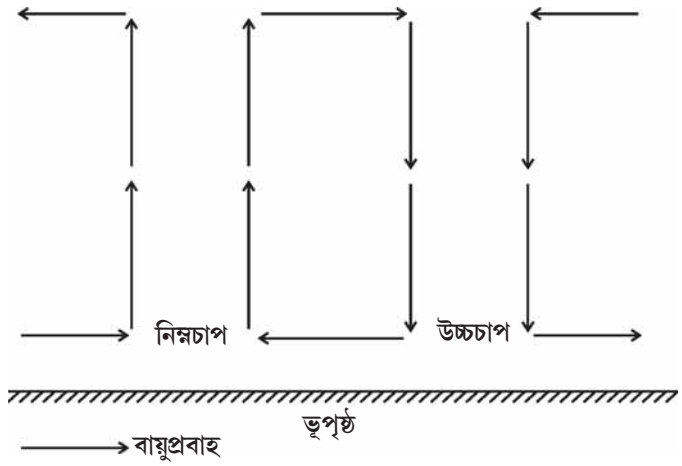

সমুদ্রপৃষ্ঠে গড় বায়ুর চাপ হল ১০১৩.২৫ মিলিবার। সাধানত এর থেকে চাপ বেশি হলে উচ্চচাপ বা কম হলে নিম্নচাপ হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে বায়ুর চাপ নির্ধারিত হয় স্থানীয় অবস্থার উপর।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়লে চাপ কমে, ও উষ্ণতা কমলে চাপ বাড়ে। আবার উচ্চতা বাড়লে চাপ কমে। তাহলে বলো তো উঁচু পাহাড়ে, যেমন - দার্জিলিঙে, সবসময় ঠাণ্ডা হলেও বায়ুর চাপ কম কী করে হয়?

স্থানীয়ভাবে বায়ুর চাপের তারতম্য থাকেই, কিন্তু পৃথিবীতে কয়েকটি স্থায়ী বায়ুর চাপবলয় ও বায়ুচাপ কক্ষ রয়েছে। এগুলি তৈরি হয় নির্দিষ্ট অঞ্চলের উষ্ণতা, পৃথিবীর আবর্তন গতি, ইত্যাদির ভিত্তিতে। যেমন — নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যের লম্বরশ্মি কারণে উষ্ণতা সবসময়ই বেশি থাকে। এইকারণে বায়ু উষ্ণ ও হাল্কা হয়ে উপরে উঠতে থাকে। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আবর্তন গতি সর্বাধিক হওয়ার ফলে কেন্দ্র বহির্মুখী বল সবচেয়ে বেশি ও সেই কারণে বায়ু বিক্ষিপ্ত হয় সবচেয়ে বেশি। উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য **নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর স্থায়ী নিম্নচাপ বলয়** অবস্থান করে।

নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে যে বায়ু উপরে ওঠে তা শীতল ও ভারী হয়ে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের আশেপাশে নেমে আসে। ফলে **উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উচ্চচাপ** তৈরি হয় তা বলয়রূপে অবস্থান করে। মেরু অঞ্চলে সূর্যের তির্যক রশ্মি পড়ার ফলে সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। মেরু অঞ্চলের বায়ু তাই শীতল ও ভারী। এখানে সর্বদাই **উচ্চচাপ** বিরাজ করে। এখান থেকে এই বায়ু মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলের (৬০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ) দিকে প্রবাহিত হয় ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়ে আবর্তন গতির কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে উপরে উঠে নিম্নচাপ সৃষ্টি করে ও এভাবে **মেরুবৃত্তীয় নিম্নচাপ বলয়** সৃষ্টি হয়। সুতরাং সর্বমোট **সাতটি চাপ বলয়** তৈরি হয়েছে পৃথিবীর উপর — একটি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, দুটি উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় (কর্কটীয় ও মকরীয়), দুটি মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় (সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয়) এবং দুটি মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় (সুমেরু ও কুমেরু)। চাপের তারতম্যের কারণে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ু চাপবলয়গুলির মধ্যে সারাবছর বায়ু প্রবাহিত হয়।

চাপবলয়গুলির মধ্যে বায়ু সারাবছর একই দিকে, একইভাবে প্রবাহিত হয়, তবে গতিবেগের তারতম্য ঘটে। উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়গুলি থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় আয়ন বায়ু। আবার ওই উচ্চচাপ বলয়গুলি থেকে মেরু বৃত্তপ্রদেশীয় নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় পশ্চিমা বায়ু। আর মেরু দেশীয় উচ্চচাপ থেকে মেরু বায়ু প্রবাহিত হয় মেরু বৃত্তপ্রদেশীয় নিম্নচাপের দিকে। এই বায়ুগুলিকে বলে **নিয়ত বায়ু**। দক্ষিণ মেরু থেকে ক্রমশ উত্তর মেরুর দিকে গেলে যে যে বায়ু চাপবলয়গুলি পাব তা নীচের চিত্রের সাহায্যে বুঝে নাও।

জেনে রাখো

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এক প্রকার বল উৎপন্ন হয় যা কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কাজ করে। এই বলের প্রবণতা হলো যেকোনো বস্তুকে বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। এই কেন্দ্র বর্হিমুখী বলকেই কেন্দ্রাতিগ বল বলে।

✸ তাহলে বলোতো, আমরা কেন পৃথিবী থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিনা?

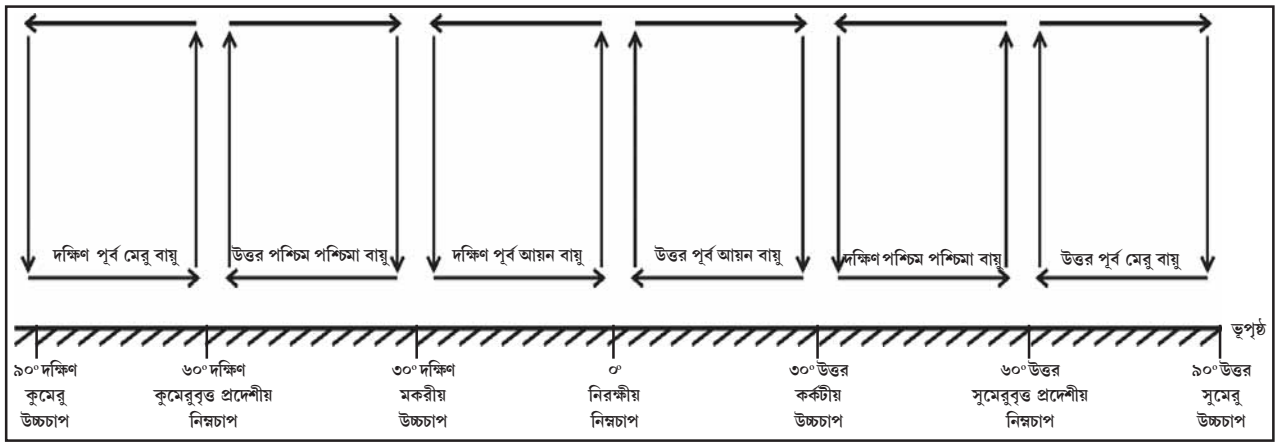

পৃথিবীর চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ

নিয়ত বায়ু যেমন সারাবছর প্রবাহিত হয়, এমন কিছু বায়ু আছে যেগুলি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এগুলিকে বলে **সাময়িক বায়ু**। যেমন - ভারতীয় উপমহাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ু। একইভাবে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু অনেক ছোটো অঞ্চলকে প্রভাবিত করে **স্থানীয় বায়ু**। এগুলি কোথাও উষ্ণ, আবার কোথাও শীতল। ভারতে প্রবাহিত উষ্ণ 'লু' বায়ু ও ফ্রান্সে প্রবাহিত শীতল 'মিস্ট্রাল' বায়ু এর আদর্শ উদাহরণ।

দুটি স্থানের মধ্যে বায়ুচাপের পার্থক্য খুব বেশি হলে বায়ুর গতিবেগ অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই ধরনের বায়ু বেশিক্ষণ বা বেশি দিন প্রবাহিত হয় না এবং এর আগমন হঠাৎ হয়, তাই এগুলি **আকস্মিক বায়ু**। সাধারণভাবে এগুলিকেই ঝড় বলে। যেমন - মে, ২০২০ তে 'আমফান' এবং মে, ২০২১-এ ঘটে যাওয়া 'ইয়াস' ঘূর্ণিঝড়।

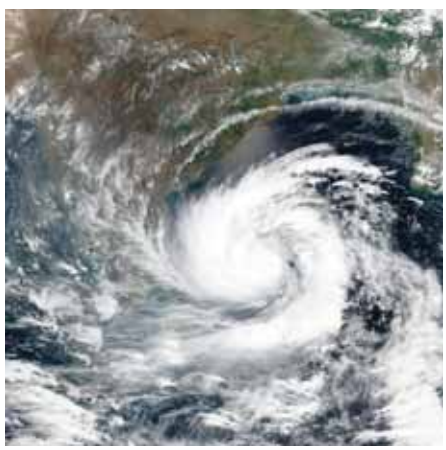

আমফান

জেনে রাখো

বায়ুর গতিপথ নির্ধারিত হয় সেই বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু মানে এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।

বায়ু কিন্তু ঠিক সোজা পথে প্রবাহিত হয় না। উত্তর গোলার্ধে সামান্য ডান দিকে বেঁকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে সামান্য বাঁদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এর কারণ কোরিওলিস বল, যা সৃষ্টি হয় পৃথিবীর আবর্তনের জন্য।

২. নীচের রেখাচিত্রে তির চিহ্ন দিয়ে বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ করা হয়েছে। শূন্যস্থানগুলিতে বায়ু চাপবলয় এবং বায়ুপ্রবাহের নাম লেখো।

মনে রাখা জুররি :

- **চাপবলয়** — নির্দিষ্ট অক্ষাংশীয় অঞ্চল বরাবর পৃথিবীকে বেষ্টন করে বায়ুর যে উচ্চচাপ বা নিম্নচাপ অঞ্চল অবস্থান করে তাকে বলে চাপবলয়।
- **নিয়ত বায়ু** — যে বায়ুপ্রবাহ সারা বছর নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে একই দিকে প্রবাহিত হয়।
- **সাময়িক বায়ু** — বছরের বা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত বায়ু যা একটি বৃহৎ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানীয় বায়ু** — বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যে উষ্ণ বা শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত কোনো ছোটো অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- **আকস্মিক বায়ু** — ঋণাত্মক বায়ুপ্রবাহ, যার আগমন ও প্রত্যাগমন অত্যন্ত আকস্মিক।

তোমরা অষ্টম শ্রেণির 'চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ' অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়ুর অবস্থান, সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :**

১.১ পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হলো —

(ক) চন্দ্র (খ) সূর্য (গ) শুক্র (ঘ) মঙ্গল।

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর _____ চাপ বিরাজ করে।

২.১.২ একটি সাময়িক বায়ুর উদাহরণ হলো _____ বায়ু।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'মিথ্যা' লেখো :

২.২.১ উপক্রান্তীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ বিরাজ করে।

২.২.২ বায়ু সবসময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ	
২.৩.১	নিয়ত বায়ু	১.	ঘূর্ণিঝড়
২.৩.২	সাময়িক বায়ু	২.	লু
২.৩.৩	স্থানীয় বায়ু	৩.	মৌসুমি বায়ু
২.৩.৪	আকস্মিক বায়ু	৪.	আয়ন বায়ু

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ কোন অঞ্চলে সর্বদা উচ্চচাপ বিরাজ করে?

২.৪.২ মিস্ট্রাল কোন প্রকার বায়ু?

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :

৩.১ আকস্মিক বায়ু কাকে বলে?

৩.২ কোন অবস্থাকে আমরা নিম্নচাপ বলে থাকি?

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৪.১ নিরক্ষীয় অঞ্চলে কেন সারাবছর নিম্নচাপ থাকে?

৪.২ বায়ু কেন সোজাপথে প্রবাহিত হয় না?

৫. নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৫.১ বায়ু চাপবলয় ও নিয়ত বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

5 মেঘ ও বৃষ্টি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মেঘ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৃষ্টির শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।

সূর্যের তাপে পৃথিবীর সমস্ত ভূমিভাগ ও জলভাগ উত্তপ্ত হয় আমরা জানি। ভূমিভাগ উত্তপ্ত হলে সেই তাপ ক্রমে বায়ুস্তরে সঞ্চারিত হয়। জলভাগ উত্তপ্ত হলে ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হতে থাকে। অর্থাৎ জল, তরল অবস্থা থেকে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না। এই জলীয় বাষ্প হাল্কা বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। এই উচ্চতায় তাপমাত্রা খুব কম ও এখানে ভাসমান শীতল ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প আবার জলকণায় পরিণত হয় ও ওই ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ভেসে বেড়ায়। যে প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প আবার জলকণায় পরিণত হয় তাকে বলে ঘনীভবন। এই ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণা আশ্রিত জলবিন্দুকেই আমরা মেঘ বলি।

বিশেষ কথা

মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আকাশে থাকলে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠে থাকলে কুয়াশা! একই পদ্ধতিতে দুটিই তৈরি হয়। যেমন- দার্জিলিঙের পাহাড়ে উঠতে গিয়ে দেখা গেল পাহাড় মেঘে ঢাকা, কিন্তু যখন দার্জিলিং পৌঁছালে তখন দেখলে তুমি কুয়াশার মধ্য দিয়ে চলেছ।

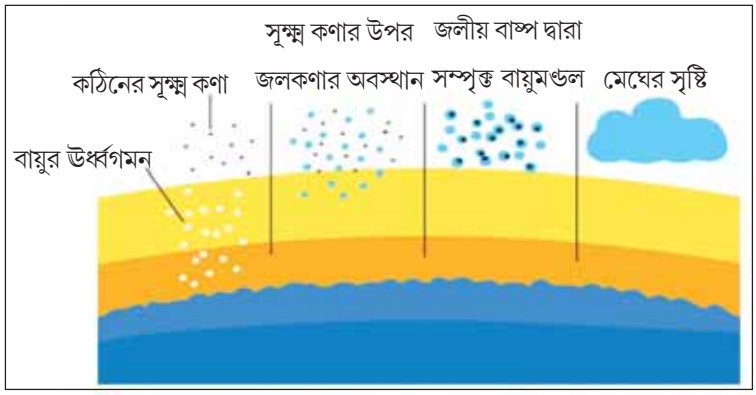

যখন ছোট ছোট জলবিন্দু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড় ও ভারী হয়, তখন তা আর ভেসে থাকতে পারে না। পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। একেই বলে বৃষ্টি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক উঁচু মেঘে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় চলে যায়। অর্থাৎ বরফ হয়ে যায়। নীচে নামতে নামতে এই বরফ কখনো সম্পূর্ণ রূপে গলে গিয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হয়, কখনো না গলে বরফ রূপেই নেমে আসে, আবার কখনো জল ও বরফের কুচি একইসঙ্গে নেমে আসে। এই সব একত্রে **অধঃক্ষেপণ** নামে পরিচিত। অধঃক্ষেপণের প্রকৃতি নির্ভর করে মেঘের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রা এবং ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রার উপর। বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, অধঃক্ষেপণ — এই সব প্রক্রিয়াই ঘটে ট্রপোস্ফিয়ারে বা বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নীচের স্তরে, যে স্তরে আমরা বসবাস করি। এগুলিই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায় এবং তা শুধু ট্রপোস্ফিয়ারেই ঘটে থাকে। ট্রপোস্ফিয়ারে যত উঁচুতে ওঠা যায় তাপমাত্রা ততই কমে। ফলে জলীয় বাষ্প নিয়ে উষ্ণবায়ু উপরে উঠতে থাকলে ক্রমশ শীতল হতে থাকে, ঘনীভবন ঘটে ও মেঘ সৃষ্টি হয়। মেঘ নানান প্রকার হয়, কিন্তু সব মেঘ থেকে অধঃক্ষেপণ ঘটে না। বায়ুতে জলীয় বাষ্প

থাকাটাই যথেষ্ট নয়, বায়ুকে সম্পৃক্ত হতে হবে, অর্থাৎ বায়ুকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ হতে হবে। বায়ুর উষ্ণতা যত বেশি হবে তত জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশি হবে ও সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। তাই বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকলেও সবসময় অধঃক্ষেপণ ঘটে না। আবার বৃষ্টিপাত সবসময় একই রকম বা একই পদ্ধতিতেও হয় না। সাধারণত তিন প্রকারের বৃষ্টিপাত হয় — শৈলোৎক্ষেপ, পরিচলন ও ঘূর্ণবাত।

✸ **শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :**

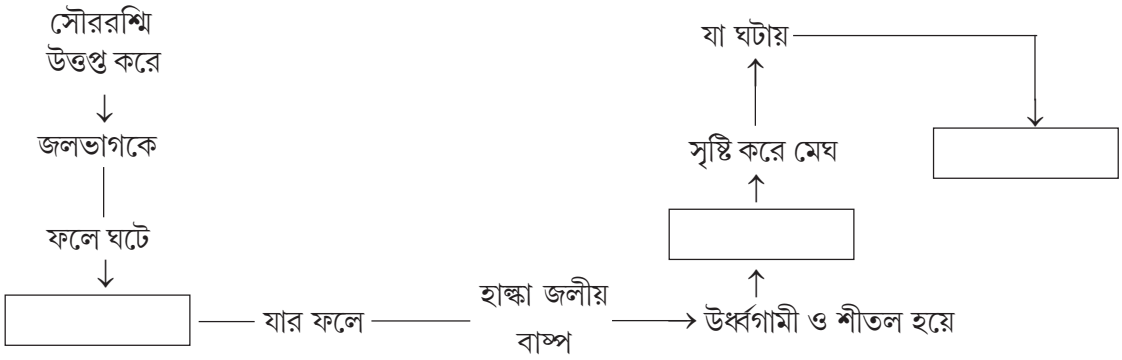

শব্দভাণ্ডার : বাষ্পীভবন, ঘনীভবন প্রক্রিয়ায়, অধঃক্ষেপণ

দৈনন্দিন কথোপকথনে আমরা বলে থাকি বৃষ্টি পড়ে, আবার শিশিরও পড়ে। বলোতো, শিশির কি সত্যিই পড়ে আকাশ থেকে?

মনে রাখা জরুরি :

- **বাষ্পীভবন** — তরল অবস্থা থেকে জল যে প্রক্রিয়ায় বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।
- **ঘনীভবন** — জলীয় বাষ্প যে প্রক্রিয়ায় তরল জলে পরিবর্তিত হয়।

তোমরা মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণির 'মেঘ-বৃষ্টি' অধ্যায়ে বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ সূর্যের তাপে জলের তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়াকে বলে —

(ক) ঘনীভবন (খ) বাষ্পীভবন (গ) অধঃক্ষেপণ (ঘ) পরিচলন।

১.২ ভূপৃষ্ঠে যা কুয়াশা, আকাশে সেটাই —

(ক) শিশির (খ) বৃষ্টিপাত (গ) মেঘ (ঘ) তুষারপাত।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ অসংখ্য_____ আশ্রিত জলকণাকেই মেঘ বলে।

২.১.২. জল ও _____সহ অধঃক্ষেপণ হতে দেখা যায়।

২.২. বাক্যটি ঠিক হলে 'সত্য' এবং ভুল হলে 'মিথ্যা' লেখো :

২.২.১. সূর্যের তাপে জল বাষ্পীভূত হয়।

২.২.২. সব ধরনের মেঘ থেকেই অধঃক্ষেপণ হয়।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর লেখো :

২.৩.১ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে?

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :

৩.১ অধঃক্ষেপণ কাকে বলে?

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

৪.১ উদাহরণসহ ঘনীভবন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

৪.২ বৃষ্টিপাত কীভাবে ঘটে ও কয় প্রকার?

6 পরিবেশের অবনমনে মানুষের ভূমিকা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরিবেশ অবনমনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষের কার্যাবলি কীভাবে পরিবেশের অবনমন ঘটায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- পরিবেশের অবনমন কীভাবে মানুষের জীবনধারণকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের অবনমনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

দূষণ শব্দটির সঙ্গে তোমরা পরিচিত। বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও অন্যান্য ক্ষতিকারক দূষক যখন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (বায়ু, জল, মাটি) সঙ্গে মেশে ও পরিবেশের স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণাবলিকে নষ্ট করে, তখন সৃষ্টি হয় **দূষণের**।

নীচের ছবিগুলির মধ্যে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা চিহ্নিত করো ।

যে সমস্ত ক্ষতিকারক অবাঞ্ছিত উপাদানগুলি দূষণ সৃষ্টি করে সেগুলিই হলো **দূষক**। যেমন — কলকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া, পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল, আবর্জনা ইত্যাদি।

✸ **নীচের সারণিতে বামদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নাম লেখা আছে। ডানদিকের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সম্ভাব্য উৎপন্ন দূষকের নাম লেখো।**

বিভিন্ন ক্ষেত্র	উৎপন্ন দূষক
কৃষিক্ষেত্র	
শিল্পক্ষেত্র	
পরিবহন	
গৃহস্থালী	

তোমরা যে দূষকগুলি চিহ্নিত করলে ভালো করে সেগুলি সম্বন্ধে ভেবে দেখো। দেখবে, যে সমস্ত উপাদানগুলির মাধ্যমে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ দূষকগুলি মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট। মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। ফলে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেটি অনেক ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এই নেতিবাচক প্রভাবেই **পরিবেশ দূষণ** ও **পরিবেশের অবনমন** ঘটে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয়ের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানগুলির গুণমানের অধঃপতনকেই **পরিবেশের অবনমন বলে।**

পরিবেশের অবনমনের ফলে প্রাকৃতিক উপাদানের গুণমানের যে অধঃপতন ঘটে, তা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়। অর্থাৎ পরিবেশ দ্রুত ক্ষতিপূরণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। এই অবস্থা মানবজীবনে যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

পরিবেশের অবনমনের কারণ

প্রাকৃতিক

(১) ভূমিকম্প

(২) ধ্বস

(৩) খরা

(৪) ঘূর্ণিঝড়

মনুষ্যসৃষ্ট

(১) বনচ্ছেদন

(২) অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার

(৩) নগরায়ন

(৪) অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ

(৫) যথেচ্ছ সম্পদ আহরণ

(৬) অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন

(৭) রাসায়নিক বিপর্যয়

রাসায়নিক বিপর্যয়

বৃক্ষচ্ছেদন

পরিবেশ অবনমনের ফলাফল

- মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব
- জীববৈচিত্র্য হ্রাস
- সম্পদের হ্রাস প্রাপ্তি
- বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ফলে মানবজীবনে বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভোরে ভূপালের UNION CARBIDE কারখানা থেকে MIC (মিথাইল আইসোসায়ানেট) নামে একটি গ্যাস বেরিয়ে ভূপাল শহরের বাতাসে ছড়িয়ে মারাত্মক বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে। এই গ্যাস বায়ুকে এমনভাবে দূষিত করে যে তৎক্ষণাৎ ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হয় এবং বহু মানুষ শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যেমন — অনেক মানুষ স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হন। এর প্রভাব যে শুধু মানুষের উপরই পড়েছিল তা নয়, অনেক পশু-পাখিও মারা যায়, গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় ও জল দূষিত হয়ে পড়ে।

এছাড়া এইরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে মানুষ যখনই অনিয়ন্ত্রিতভাবে নিজেদের জন্য উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছে এবং প্রকৃতিকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে, তা ডেকে এনেছে পরিবেশের অবনমন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

তাই পরিবেশের এই অবনমনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের সচেতনভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যাতে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের অবনমন না ঘটে।

পরিবেশের অবনমন নিয়ন্ত্রণের উপায়

(১) বৃক্ষরোপণ, (২) সম্পদের যথেচ্ছ আহরণ ও ব্যবহার কমানো, (৩) শিল্প, কৃষি ও গৃহস্থালীর বর্জ্যের পরিমাণ কমানো, (৪) জনসচেতনতা বৃদ্ধি, (৫) আইন প্রণয়ন।

ভারতে পরিবেশ রক্ষার জন্য কতকগুলি আইন আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো —

- National Green Tribunal Act, 2010
- Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981
- Environment Protection Act, 1986
- Hazardous waste management Rules, 2016

পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের অবনমনের মধ্যে পার্থক্য

প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো উপাদানের মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনো পদার্থ অনুপ্রবেশ করে যদি পরিবেশের গুণমান নষ্ট করে তবে তা হলো দূষণ। এই দূষণের মাত্রা যদি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ, উদ্ভিদ-প্রাণীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে তখন **পরিবেশের অবনমন ঘটে**।

মনে রাখা জরুরি :

- **দূষণ** — প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির গুণমানের নেতিবাচক পরিবর্তন হল দূষণ।
- **পরিবেশের অবনমন** — প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয়ের দ্বারা পরিবেশের গুণমানের অধঃপতনই হলো **পরিবেশ অবনমন**।
- **বিপর্যয়** — যখন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট কোনো কারণে খুব কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিবেশের এমন অবনমন সৃষ্টি হয়, যে তার ফলে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে এবং ক্ষতি হয়, তখন তাকে **বিপর্যয়** বলা হয়।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'মানুষের কার্যাবলি ও পরিবেশের অবনমন' অধ্যায়ে আরও বিশদে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ Environment Protection Act চালু হয় —

(ক) ১৯৮১ সালে (খ) ১৯৮২ সালে (গ) ১৯৮৪ সালে (ঘ) ১৯৮৬ সালে।

১.২ ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারী গ্যাসটি হলো —

(ক) MIC (খ) NH_3 (গ) CO_2 (ঘ) CFC

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

২.১.১ ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা হয় _____ সালে।

২.১.২ পরিবেশ অবনমন নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হলো _____।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো:

২.২.১ নগরায়ন পরিবেশের অবনমন সৃষ্টি করে।

২.২.২ পরিবেশের অবনমনের ফলে মানবজীবনে খুব একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

২.৩. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ National Green Tribunal Act	১. পরিবেশের অবনমন
২.৩.২ সম্পদের হ্রাস প্রাপ্তি	২. জলদূষণের উৎস
২.৩.৩ গৃহস্থালীর তরল আবর্জনা	৩. 2010

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ পরিবেশ অবনমনের একটি প্রাকৃতিক কারণ লেখো।

২.৪.২ বায়ুদূষণের একটি মনুষ্যসৃষ্ট উৎসের নাম লেখো।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৩.১ পরিবেশ দূষণ কাকে বলে?

৩.২ পরিবেশগত বিপর্যয় বলতে কী বোঝো?

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ অবনমনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

1.1 ”!Çþ’ öþ™!Øþ› þ™!Øþ›y îyë ç vþ_îöþ™î xyë˜ îyë ²Ìîy!£“þ £ë ôôô

S„þV ¢ö›î vþF‰þ‰þyþ™ îœë ö í ö„þ

S…V ›„þî#ë vþF‰þ‰þyþ™ îœë ö í ö„þ

S†V „þ„þÝþ#ë vþF‰þ‰þyþ™ îœë ö í ö„þ

S‡V „þö›î vþF‰þ‰þyþ™ îœë ö í ö„þ

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

2.1.1 öë îyë îŠöîî !˜!”Tþ ¢›ë !îîyÝþ xMþöœî vþ™î !”öë ²Ìîy!£“þ £ë “þyö„þ îöœ __________ îyëÐ

2.1.2 öë ²Ì!„þëyë ‹œ “þîœ xîÞíy ö í ö„þ îyÜ™#ë xîÞíyë þ™!îî!“þ“þ £ë “þyö„þ îöœ ___________Ð

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে ‘ঠিক’ এবং অসত্য হলে ‘ভুল’ লেখো :

2.2.1 !Ÿ!Ÿî ~„þ²Ì„þyî x•ƒöÇþ™’Ð

2.2.2 þ™!Øþ›y îyë ~„þ²Ì„þyî Þíy˜#ë îyëÐ

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

2.3.1 ö›î î_²Ìö”Ÿ#ë xMþöœ îyëî ‰þyþ™ ¢y•yî’“þ ö„þ›˜ íyö„þÚ

2.3.2 “þyþ™›yey !£›yöA„þî ˜#ö‰þ íy„þöœ „þ# ²Ì„þyî x•ƒöÇþ™ö’î ¢½þyî˜y íyö„þÚ

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

3.1. îyë›[þöœ vþ¡“þyî ¢öA† ‰þyöþ™î ¢Á™„þ „þ#Ú

3.2. xö˜„þ vþ‰þ ö›ö‡ ‹œ „þ# xîÞíyë íyö„þÚ

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

4.1 ö›‡ „þ#¦þyöî ¢!Tþ £ëÚ

4.2 îyë ö„þ˜ vþF‰þ‰þyþ™ ö í ö„þ !˜Á‰þyöþ™î !”ö„þ ²Ìîy!£“þ £ë îÄy…Äy „þöîyÐ

4.3 Þíy˜#ë îyëî ”!Ýþ ÷î!ŸTþÀ vþö í… „þöîyÐ

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

5.1 îyë ²Ìîyö£î ö×!’!î¦þy† „þöî !˜ë“þ îyëî vþ”y£î’¢£ ÷î!ŸTþÀ öœö…yÐ

5.2 x•ƒöÇþ™ö’î ¢Á™’ ²Ì!„þëy!Ýþ îÄy…Äy „þöîyÐ

7 উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- উত্তর আমেরিকার ভৌগোলিক সীমা, অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- উত্তর আমেরিকার ভূপ্রকৃতি ও নদনদী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখা করতে পারবে।
- উত্তর আমেরিকার জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক লিখতে পারবে।

বলতে পারো এশিয়া ও আফ্রিকার পর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশটির নাম কী? এই মহাদেশে রয়েছে ছোটো বড়ো ২৩টি দেশ। সেই মহাদেশটির সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হলো —

- আজ থেকে মাত্র ৫০০ বছর আগে ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক পর্তুগিজ নাবিক এই মহাদেশটি প্রথম আবিষ্কার করেন।
- এই মহাদেশের আকৃতি অনেকটা ওলটানো ত্রিভুজের মতো (যার উপরের অংশ চওড়া এবং নীচের অংশ ক্রমাগত সরু হয়ে গেছে)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড, বিখ্যাত গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, বৃহত্তম সুপেয় জলের হ্রদ সুপিরিয়র এই মহাদেশেই অবস্থিত।
- এই মহাদেশের বিখ্যাত দেশগুলি হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি।
- প্রধান প্রধান শহরগুলি হলো — ওয়াশিংটন ডি.সি. নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, মহাদেশটির নাম **উত্তর আমেরিকা**।

এসো এবার জেনে নিই উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক বিশেষত্বগুলি —

অবস্থান

পূর্বে ২০° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৭৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং দক্ষিণে ৭° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৮৪° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাদেশ।

সমুদ্রেঘেরা সীমা

পূর্বে আটলান্টিক, দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর সুমেরু মহাসাগর অন্যান্য মহাদেশ থেকে এই মহাদেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও জল দ্বারা বেষ্টন করে মহাদেশটিকে সুরক্ষিত করেছে।

সংকীর্ণ ভূখণ্ড পানামা যোজক দ্বারা উত্তর আমেরিকা মহাদেশটি দক্ষিণ আমেরিকার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু সামুদ্রিক দূরত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে যে পানামা খাল খনন করা হয়েছিল সেটি দুই মহাদেশকে আলাদা করে দিয়েছে। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অর্থনীতি ও জলবায়ু ভূপ্রকৃতি দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত।

এখন আমরা উত্তর আমেরিকার ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করবো —

উত্তর আমেরিকা
রাজনৈতিক
কি.মি.
কি.মি.
৪১০ ০ ৪১০ ৮২০ ১২৩০
এশিয়া
৭০° উঃ
৮০° উঃ
উত্তর মহাসাগর
গ্রিনল্যান্ড
ডেনমার্ক প্রণালী
৬০° উঃ
বেরিং প্রণালী
আলাস্কা
পরকুপাইন
ভিক্টোরিয়া দ্বীপ
বাফিন দ্বীপ
ডেভিস প্রণালী
গ্রেটবিয়ার হ্রদ
উত্তর পশ্চিম অঞ্চল
হাডসন প্রণালী
ল্যাব্রাডর সাগর
বেলে আইল প্রণালী
গ্রেটস্লেভ হ্রদ
কা না ডা
হাডসন উপসাগর
৫০° উঃ
নিউফাউন্ডল্যান্ড
অ্যালবার্টা
ব্রিটিশ কলম্বিয়া
কুইবেক
সাসকাচুয়ান
অন্টারিও
উইনিপেগ
অটোয়া
৪০° উঃ
ওয়াশিংটন
মন্টানা
উইসকনসিন
স্যাডবেরি
পেনসিলভেনিয়া
ডেট্রয়েট
নিউইয়র্ক
নেভাদা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
শিকাগো
নিউ জার্সি
ওয়াশিংটন ডি সি
সানফ্রানসিসকো
কলোরাডো
কানসাস
ক্যালিফোর্নিয়া
কেনটাকি
৩০° উঃ
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
লস এঞ্জেলেস
অ্যারিজোনা
ওকলাহোমা
আলাবামা
জর্জিয়া
টেক্সাস
ফ্লোরিডা
২৩° ১/২ উঃ
ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
মেক্সিকো
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র
২০° উঃ
হাভানা
ফ্লোরিডা প্রণালী
মেক্সিকো উপসাগর
কিউবা
হাইতি
জামাইকা
মেক্সিকো সিটি
বেলিজ
গুয়াতেমালা
হন্ডুরাস
ক্যারিবিয়ান সাগর
নিকারাগুয়া
এল সালভাডর
পানামা
দক্ষিণ আমেরিকা
কোস্টারিকা
১১০° পঃ
১০০° পঃ
৯০° পঃ

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ

ভূপ্রাকৃতিক মূল বিভাগ	উপবিভাগ	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল (কর্ডিলেরা নামে পরিচিত)	(ক) পূর্বের পর্বতশ্রেণি (খ) মধ্যের পর্বতশ্রেণি (গ) পশ্চিমের পর্বতশ্রেণি	➢ **বিস্তার :** উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর উত্তরে বেরিং প্রণালী থেকে দক্ষিণে পানামা যোজক পর্যন্ত বিস্তৃত। ➢ **সৃষ্টির কারণ :** প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত ও উত্তর আমেরিকান মহাদেশীয় পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ➢ **প্রকৃতি :** নবীন ভঙ্গিল পর্বত। ➢ **প্রধান প্রধান পর্বত :** রকি, কোস্টরেঞ্জ, আলাস্কা রেঞ্জ, সিয়েরা নেভেদা প্রভৃতি। আলাস্কা পর্বতের মাউন্ট ম্যাককিনলে (৬১৯০ মিটার, যার বর্তমান নাম দেনালি) এই মহাদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ। ➢ **নদনদী :** কলোরাডো, ইউকন, ফ্রেজার নদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কলোরাডো নদীর **গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন** পৃথিবীর গভীরতম (৬০০০ ফুট) ক্যানিয়ন।
মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল	(ক) সেন্ট লরেন্স নদী অববাহিকার সমভূমি (খ) পঞ্চহ্রদের সমভূমি (গ) প্রেইরী সমভূমি (ঘ) মিসিসিপি-মিসৌরি নদী অববাহিকার সমভূমি	➢ **বিস্তার :** পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে পূর্বের উচ্চভূমির মধ্যবর্তী উত্তরে সুমেরু থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ➢ **পঞ্চহ্রদ :** সুপিরিয়র, মিচিগান, হিউরন, ইরি ও অন্টারিও এই পঞ্চহ্রদের সমভূমি অঞ্চল বিখ্যাত। ➢ মহাদেশের মধ্যভাগে এই প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চল অবস্থিত। ➢ সমগ্র সমভূমির দক্ষিণদিকে পাখির পায়ের মতো ব-দ্বীপ সমভূমি গঠিত হয়েছে।
কানাডীয় বা লরেন্সীয় উচ্চভূমি		মহাদেশের উত্তরাংশে হাডসন উপসাগরকে কেন্দ্র করে প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত বিস্তীর্ণ উচ্চ মালভূমি অবস্থিত। একে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলও বলে।
পূর্বদিকের উচ্চভূমি	(ক) উত্তরের লাব্রাডর মালভূমি (খ) মধ্যভাগের নিউ ইংল্যান্ড উচ্চভূমি (গ) দক্ষিণের অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল	➢ **বিস্তার :** উত্তরে লাব্রাডর থেকে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সমগ্র পূর্বাংশ জুড়ে এই উচ্চভূমি বিস্তৃত। ➢ **প্রকৃতি :** ক্ষয়জাত প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতমালা। ➢ এই অঞ্চলের সেন্ট লরেন্স নদী অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল ও লরেন্সীয় মালভূমিকে পৃথক করেছে। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট মিচেল (২০৩৭ মিটার)।

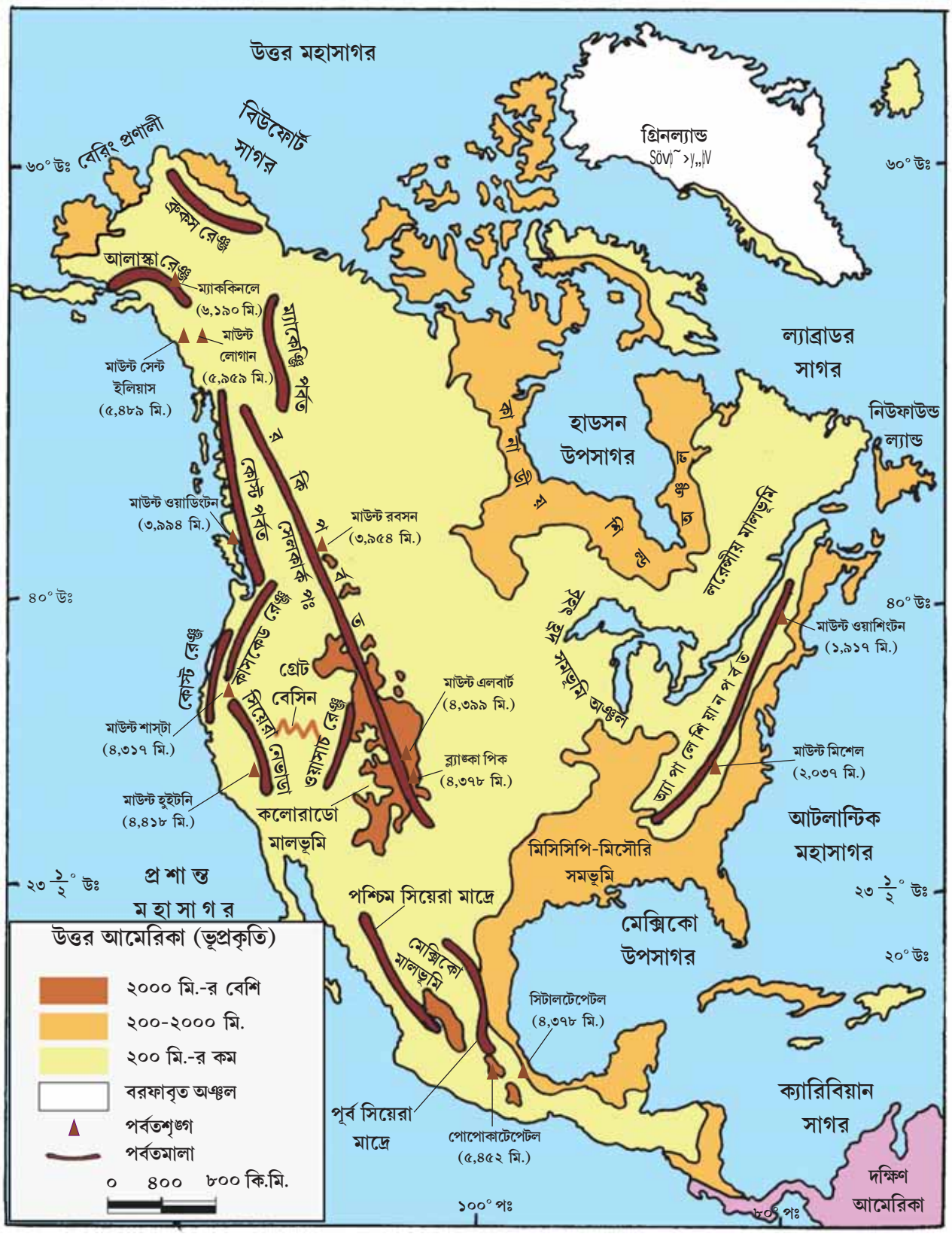

উত্তর মহাসাগর
বিউফোর্ট সাগর
বেরিং প্রণালী
৬০° উঃ
গ্রিনল্যান্ড
ব্রুকস রেঞ্জ
আলাস্কা রেঞ্জ
ম্যাককিনলে (৬,১৯০ মি.)
মাউন্ট লোগান (৫,৯৫৯ মি.)
মাউন্ট সেন্ট ইলিয়াস (৫,৪৮৯ মি.)
ম্যাকেঞ্জি পর্বত
ল্যাব্রাডর সাগর
নিউফাউন্ড ল্যান্ড
হাডসন উপসাগর
কোস্ট পর্বত
মাউন্ট ওয়াডিংটন (৩,৯৯৪ মি.)
রকি পর্বত
মাউন্ট রবসন (৩,৯৫৪ মি.)
সেলকার্ক পঃ
লরেন্সীয় মালভূমি
৪০° উঃ
ক্যাসকেড রেঞ্জ
কোস্ট রেঞ্জ
গ্রেট বেসিন
সিয়েরা নেভাডা
ওয়াসাচ রেঞ্জ
মাউন্ট এলবার্ট (৪,৩৯৯ মি.)
ব্ল্যাঙ্কা পিক (৪,৩৭৮ মি.)
মাউন্ট শাস্টা (৪,৩১৭ মি.)
মাউন্ট হুইটনি (৪,৪১৮ মি.)
কলোরাডো মালভূমি
মাউন্ট ওয়াশিংটন (১,৯১৭ মি.)
অ্যাপালেশিয়ান পর্বত
মাউন্ট মিশেল (২,০৩৭ মি.)
আটলান্টিক মহাসাগর
মিসিসিপি-মিসৌরি সমভূমি
২৩ $\frac{1}{2}$° উঃ
প্রশান্ত মহাসাগর
পশ্চিম সিয়েরা মাদ্রে
মেক্সিকো উপসাগর
মেক্সিকো মালভূমি
২০° উঃ
সিটালটেপেটল (৪,৩৭৮ মি.)
ক্যারিবিয়ান সাগর
পূর্ব সিয়েরা মাদ্রে
পোপোকাটেপেটল (৫,৪৫২ মি.)
দক্ষিণ আমেরিকা
১০০° পঃ
৮০° পঃ
উত্তর আমেরিকা (ভূপ্রকৃতি)
২০০০ মি.-র বেশি
২০০-২০০০ মি.
২০০ মি.-র কম
বরফাবৃত অঞ্চল
পর্বতশৃঙ্গ
পর্বতমালা
০ ৪০০ ৮০০ কি.মি.

একনজরে নদী পরিচয়

- উত্তর আমেরিকার প্রধান নদীগুলি হলো — মিসিসিপি-মিসৌরি (৬২৭০ কিমি), ম্যাকেঞ্জি, কলোরাডো, কলম্বিয়া ও সেন্ট লরেন্স (এর উপর নায়াগ্রা জলপ্রপাত)। মিসিসিপি-মিসৌরি এই মহাদেশের দীর্ঘতম নদী।
- **গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন** — কলোরাডো নদীর শুষ্ক সুদীর্ঘ মরুপথে ৪৪৬ কিমি দীর্ঘ, প্রায় ১৮০০ মিটারের বেশি গভীরতাযুক্ত ক্যানিয়ন বিশ্বের গভীরতম ক্যানিয়ন।
- **পঞ্চহ্রদ** — হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট সুপিরিয়র, মিচিগান, হিউরন, ইরি ও অন্টারিও হ্রদকে একত্রে পঞ্চহ্রদ বলে। এই অঞ্চল কৃষি, শিল্প ও নৌ পরিবহনে খুবই উন্নত।

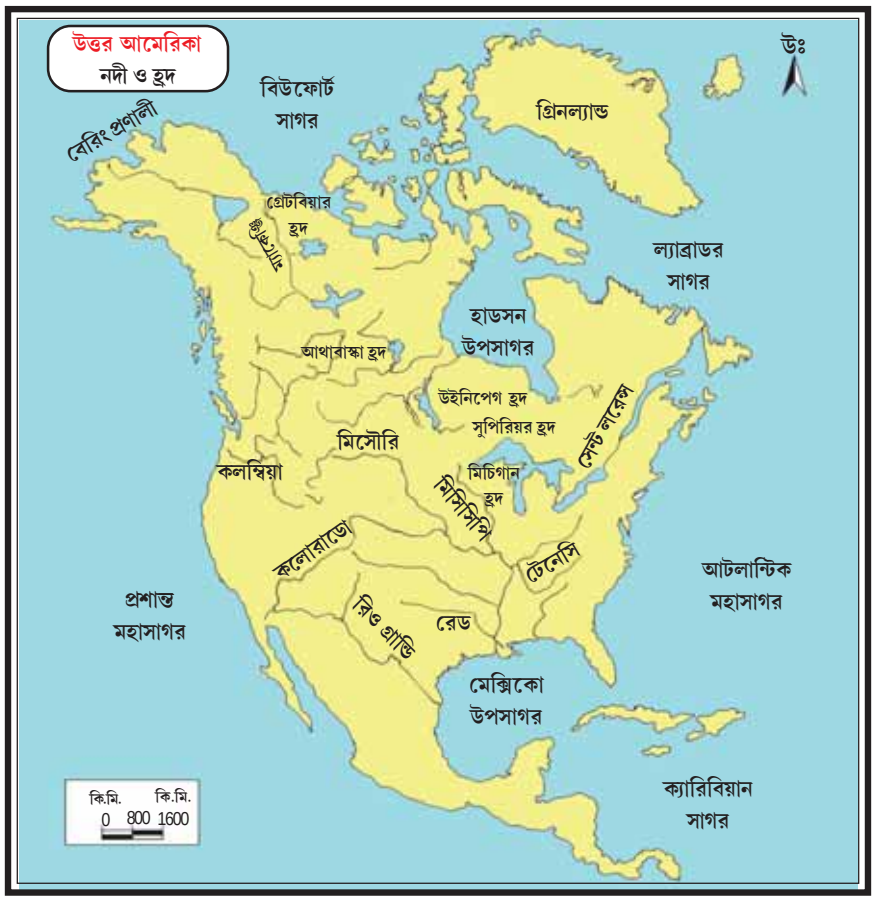

✸ **দলে আলোচনা করে নীচের সারণিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রদত্ত উত্তর আমেরিকার রেখামানচিত্রে চিহ্নিত করো এবং নীচের সারণিটি পূরণ করো।**

উত্তর আমেরিকার যে দিকে অবস্থিত	স্থলভাগ/জলভাগের নাম
উত্তরে অবস্থিত প্রণালী যা উত্তর আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে	
উত্তরে অবস্থিত মহাসাগর	
পূর্বে অবস্থিত মহাসাগর	
দক্ষিণে অবস্থিত প্রণালী	
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মহাসাগর	

একনজরে উত্তর আমেরিকার জলবায়ুগত বৈচিত্র্য

- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন প্রকৃতির হলেও সমুদ্র থেকে দূরত্বের কারণে মধ্যভাগের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির।
- অক্ষাংশগত পার্থক্যের কারণে এই মহাদেশের উত্তরাংশে শীতল জলবায়ু, একেবারে দক্ষিণাংশে ক্রান্তীয় প্রকৃতির জলবায়ু এবং বাকি মাঝের ৩০°-৬০° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে।

- বরফখাদক চিনুক নামক উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের কারণে রকি পর্বতের পূর্বঢালে বসন্তের শুরুতে শুষ্ক আবহাওয়া তৈরি হয়। রকি পর্বত এই মহাদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থান করায় উত্তরের শীতল ও দক্ষিণের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে। কারণ উপকূলীয় কর্ডিলেরাগুলি উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত।

এসো জেনে নিই জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক —

আমরা জানি, জলবায়ু সরাসরি উদ্ভিদের বণ্টন ও বিকাশে প্রভাব ফেলে।

- উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে তুন্দ্রা জলবায়ুতে মস, লাইকেন প্রভৃতি তুন্দ্রা উদ্ভিদ দেখা যায়।
- তুন্দ্রার দক্ষিণের স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম ও প্রবল শীতল (তুষারপাত) তৈগা জলবায়ুতে নরম কাঠের সরলবর্গীয় পাইন, ফার জাতীয় উদ্ভিদের সমাহার ঘটে।
- তৈগার দক্ষিণ-পূর্বের শীতল বৃষ্টিযুক্ত লরেন্সীয় জলবায়ুতে নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র (পর্ণমোচী ওক, ম্যাপল, এলম আবার সরলবর্গীয় পাইন, ফার জাতীয় উদ্ভিদের সমন্বয়) অরণ্য দেখা যায়।
- মহাদেশের অভ্যন্তরে শীতল নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন প্রেইরি জলবায়ুতে তৃণভূমির (আলফা-আলফা, শ্যাপারেল প্রভৃতি) প্রাধান্য দেখা যায়।
- মহাদেশের দক্ষিণাংশে ক্রান্তীয় উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে মেহগনি, আবলুস, রবার, পাম, কোকো জাতীয় চিরহরিৎ শক্ত কাঠের ঘন জঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। গাছগুলির পাতা পরস্পর মিশে গিয়ে বৃহৎ চাঁদোয়া তৈরি করে।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রোদ ঝলমলে শুষ্ক-গ্রীষ্ম ও আর্দ্র-শীতল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে জলপাই, কর্ক, ওক ও বিভিন্ন ধরনের ফল-ফুল ও শাক-সবজি জন্মায়।
- এই মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সোনোরান মরু অঞ্চলের প্রচণ্ড উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির প্রায় বৃষ্টিহীন মরু জলবায়ু অঞ্চলে ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়।

✸ **নীচের সারণিতে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক লেখো।**

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি	উদ্ভিদের নাম
৮ - ৯ মাস শীতকাল, মাঝে মাঝে তুষারঝড় হয়।	_____	_____
	ক্রান্তীয় আর্দ্র অরণ্য	
		জলপাই

মনে রাখা জরুরি :

- **যোজক** — দুটি মহাদেশকে সংযুক্ত করে যে সংকীর্ণ ভূ-ভাগ।
- **কর্ডিলেরা** — একাধিক পর্বতমেলা যখন পরস্পর শৃঙ্খলের ন্যায় অবস্থান করে তখন তাকে 'কর্ডিলেরা' বলে।
- **মৃত্যু উপত্যকা** — ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত উত্তর আমেরিকার সর্বনিম্ন (সমুদ্র সমতল থেকে ৯০ মিটার নীচু) স্থলভাগ। অতিরিক্ত লবণতার কারণে কোন জীব এখানে বাঁচেনা।
- **পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি** — প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চল, কারণ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'উত্তর আমেরিকা' অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চল, কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলসহ কৃষি, শিল্প, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ উত্তর আমেরিকা ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন —

(ক) ভাস্কো-দা-গামা (খ) কলম্বাস (গ) আমেরিগো ভেসপুচি (ঘ) ওয়াশিংটন।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ _____ সালে পানামা খালটি কাটা হয়েছিল।

২.১.২ _____ নদীর উপর বিশ্বের বৃহত্তম নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.১.১ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আকৃতি ওলটানো ত্রিভুজের মতো।

২.১.২ প্রেইরি অঞ্চলে আলফা-আলফা ঘাস জন্মায়।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ 'যোজক' কী?

২.৩.১ কাকে 'বরফ খাদক' বলা হয়?

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ 'পঞ্চহ্রদ' কাকে বলে?

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি তুলনা উপস্থাপন করো।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করো।

৬. উত্তর আমেরিকার প্রদত্ত মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট প্রতীকসহ চিহ্নিত করো ।

৬.১ মিসিসিপি নদী

৬.২ রকি পর্বত

৬.৩ সুপিরিয়র হ্রদ

৬.৪ আটলান্টিক মহাসাগর

৬.৫ কর্কটক্রান্তিরেখা।

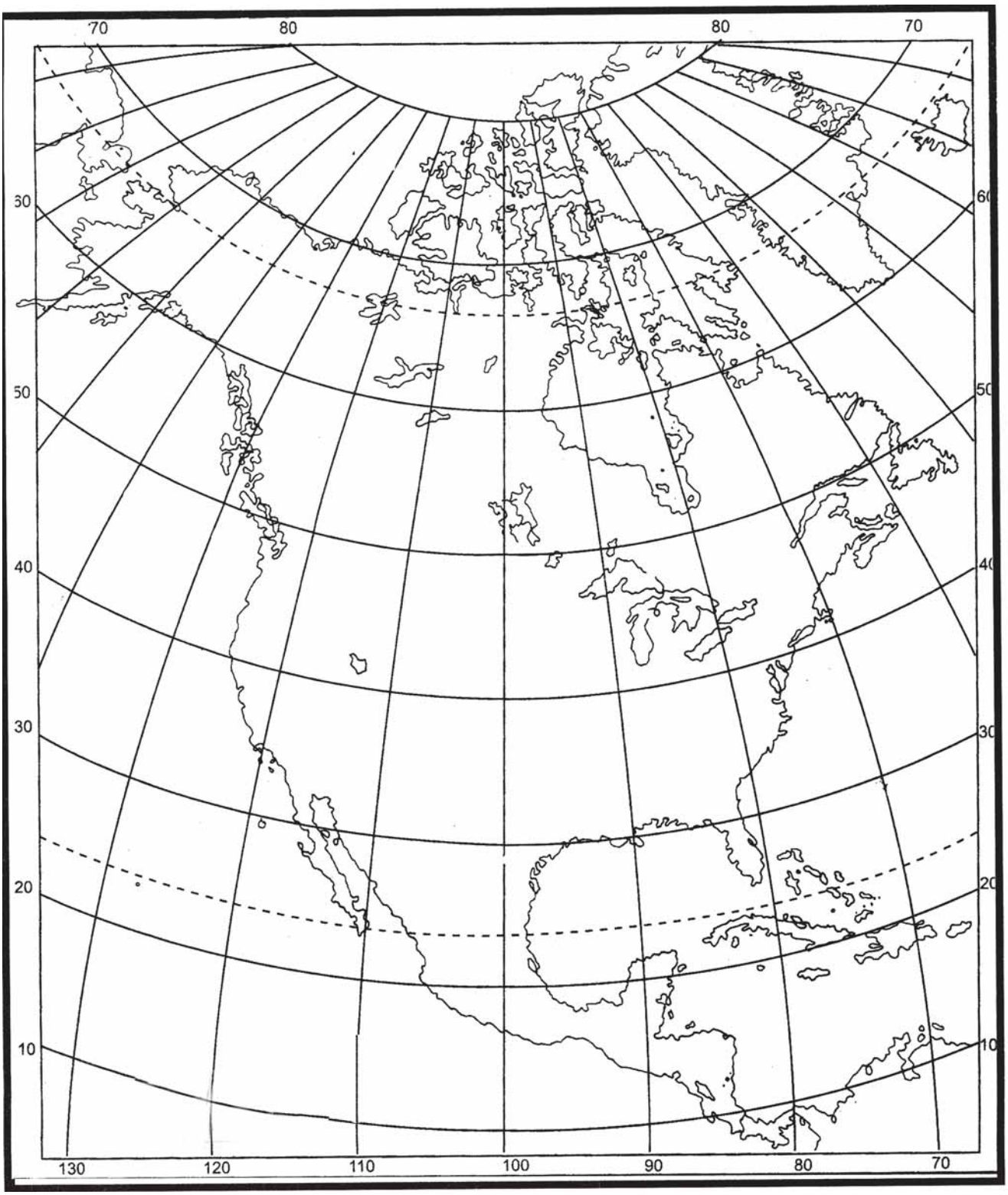
70
80
80
70
60
50
40
30
20
10
130
120
110
100
90
80
70

৪ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ভৌগোলিক সীমা, অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতি ও নদনদী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

তোমরা পৃথিবীর আমাজন নদী ও বিখ্যাত সেলভা অরণ্যের নাম শুনেছো তো? সেখানে নদীতে মাংসাশী পিরানহা মাছ, নদী পার্শ্ববর্তী বিশ্বের নিবিড়তম ঘন জঙ্গলের দিবারাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে অ্যানাকোন্ডা সাপ, রক্তচোষা বাদুড়, ট্যারান্টুলা মাকড়সা, মাংসাশী পিঁপড়ে বসবাস করে। ভয়ঙ্কর ভয়াল এই দুর্গম অরণ্যে তাই মানুষ প্রবেশ করতে চায় না। এই অরণ্যের ওপর উদ্ভিদের চাঁদোয়া স্তর ও নীচে প্রচুর কাঁটা, ঝোপঝাড় ও লতানো পরজীবী গাছ একে আরও দুর্ভেদ্য ও দুর্গম করে রেখেছে। এই দুর্গম অরণ্য, স্যাঁতস্যাঁতে জলবায়ু কোন মহাদেশে অবস্থিত- এসো এবার তা জেনে নিই।

একনজরে দক্ষিণ আমেরিকা

- পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে পর্তুগিজ নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি আবিষ্কার করেন।
- দক্ষিণ গোলার্ধের এই মহাদেশটি পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।
- ত্রিভুজাকার এই মহাদেশটি ১৩টি দেশ নিয়ে গঠিত। ক্ষেত্রফলে ভারতের প্রায় পাঁচগুণ।

অবস্থান

মহাদেশটি উত্তরে ১২°২৮′ উত্তর থেকে দক্ষিণে ৫৫°৫৯′ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার পূর্বে ৩৪°৫০′ পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ৮১°২০′ পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

সীমা

মহাদেশটিকে উত্তর-পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর জল দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

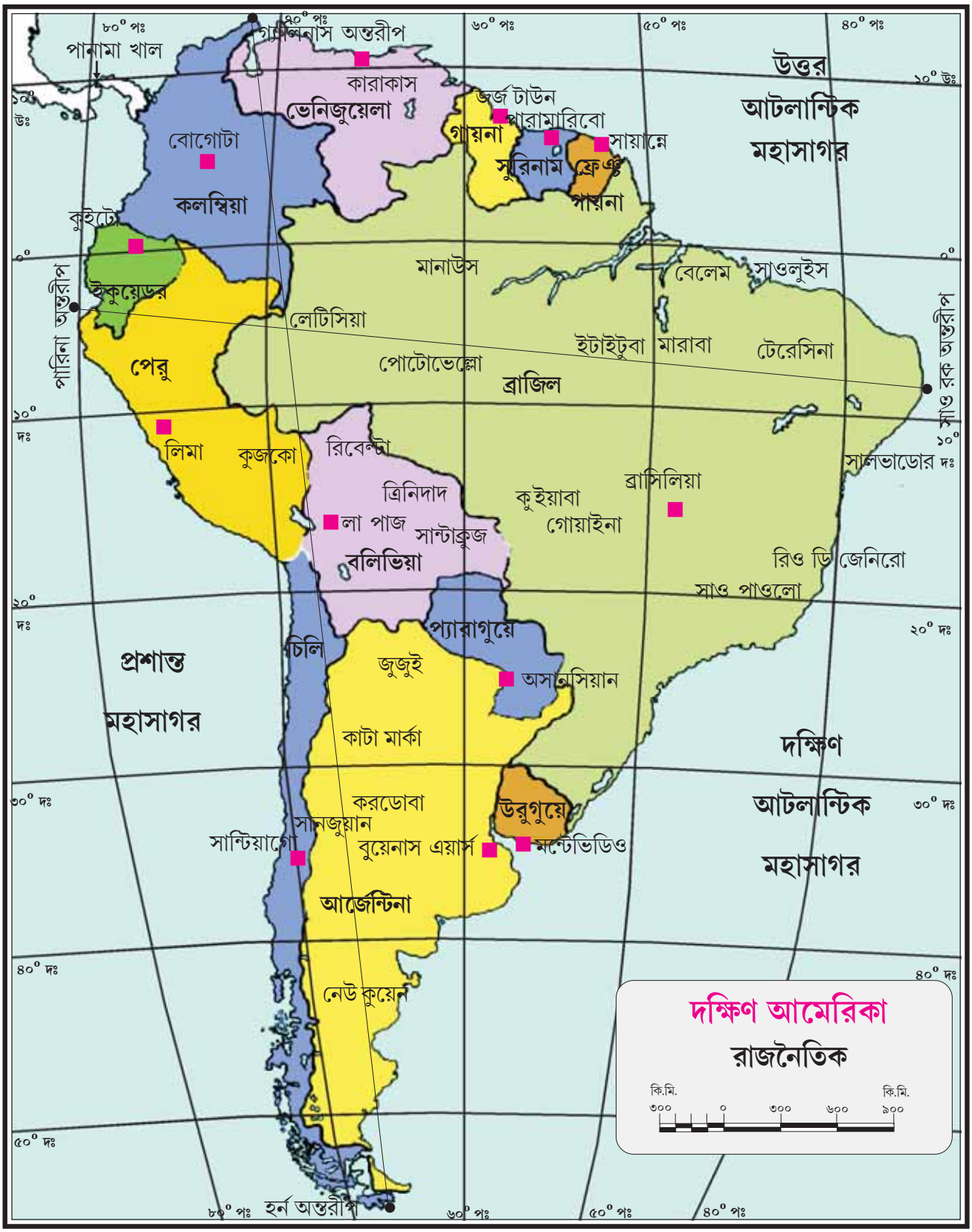

দক্ষিণ আমেরিকা
রাজনৈতিক
গ্যালিনাস অন্তরীপ
পানামা খাল
কারাকাস
ভেনিজুয়েলা
জর্জ টাউন
পারামারিবো
গায়না
সায়ান্নে
সুরিনাম
ফ্রেঞ্চ
গায়না
বোগোটা
কলম্বিয়া
কুইটো
ইকুয়েডর
পারিনা অন্তরীপ
পেরু
লিমা
কুজকো
লেটিসিয়া
মানাউস
বেলেম
সাওলুইস
ইটাইটুবা
মারাবা
টেরেসিনা
পোটোভেল্লো
ব্রাজিল
সাও রক অন্তরীপ
সালভাডোর
রিবেল্টা
ত্রিনিদাদ
লা পাজ
সান্টাক্রুজ
বলিভিয়া
কুইয়াবা
গোয়াইনা
ব্রাসিলিয়া
রিও ডি জেনিরো
সাও পাওলো
প্যারাগুয়ে
অসানসিয়ান
চিলি
জুজুই
কাটা মার্কা
করডোবা
সানজুয়ান
সান্টিয়াগো
বুয়েনাস এয়ার্স
উরুগুয়ে
মন্টেভিডিও
আর্জেন্টিনা
নেউ কুয়েন
হর্ন অন্তরীপ
প্রশান্ত
মহাসাগর
উত্তর
আটলান্টিক
মহাসাগর
দক্ষিণ
আটলান্টিক
মহাসাগর
কি.মি.
৩০০
০
৩০০
৬০০
৯০০
কি.মি.

এখন দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতিগত বিন্যাস আমরা ছকের মাধ্যমে জেনে নেবো—

দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতি

পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল	পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল	পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল		মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি অঞ্চল
বিশেষ কথা ● দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমে, উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম আন্দিজ পর্বতমালা বিস্তৃত। ● এই অঞ্চলের বিখ্যাত পর্বতবেষ্টিত মালভূমিগুলি হল— বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, টিটিকাকা । ● আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয়ের অন্তর্গত হওয়ায় অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ।	**বিশেষ কথা** ● দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমে, আন্দিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপকূলটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ● এই অঞ্চলের মাঝে প্রায় ১১০০ কিমি দীর্ঘ শুষ্ক ও খরাপ্রবণ আটাকামা মরুভূমি অবস্থিত।	**গায়ানা উচ্চভূমি** ● আমাজন নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। ● গড় উচ্চতা ৮০০ মিটার। ● পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেল (৯০০ মিটার উচ্চ) এখানেই অবস্থিত।	**ব্রাজিল উচ্চভূমি** ● আমাজন নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ● গড় উচ্চতা ১০০০ মিটার। ● পিকো-ডাবানডাইরা -এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ● আন্দিজ ও ব্রাজিল উচ্চভূমির মাঝে ম্যাটোগ্রাসো মালভূমি অবস্থিত।	ওরিনোকো নদীর অববাহিকায় ল্যানোস সমভূমি আমাজন নদীর অববাহিকায় সেলভা সমভূমি পারানা-প্যারাগুয়ে নদীর অববাহিকায় গ্রানচাকো সমভূমি দক্ষিণ-পূর্বের পম্পাস ও ক্যাম্পোস তৃণভূমি

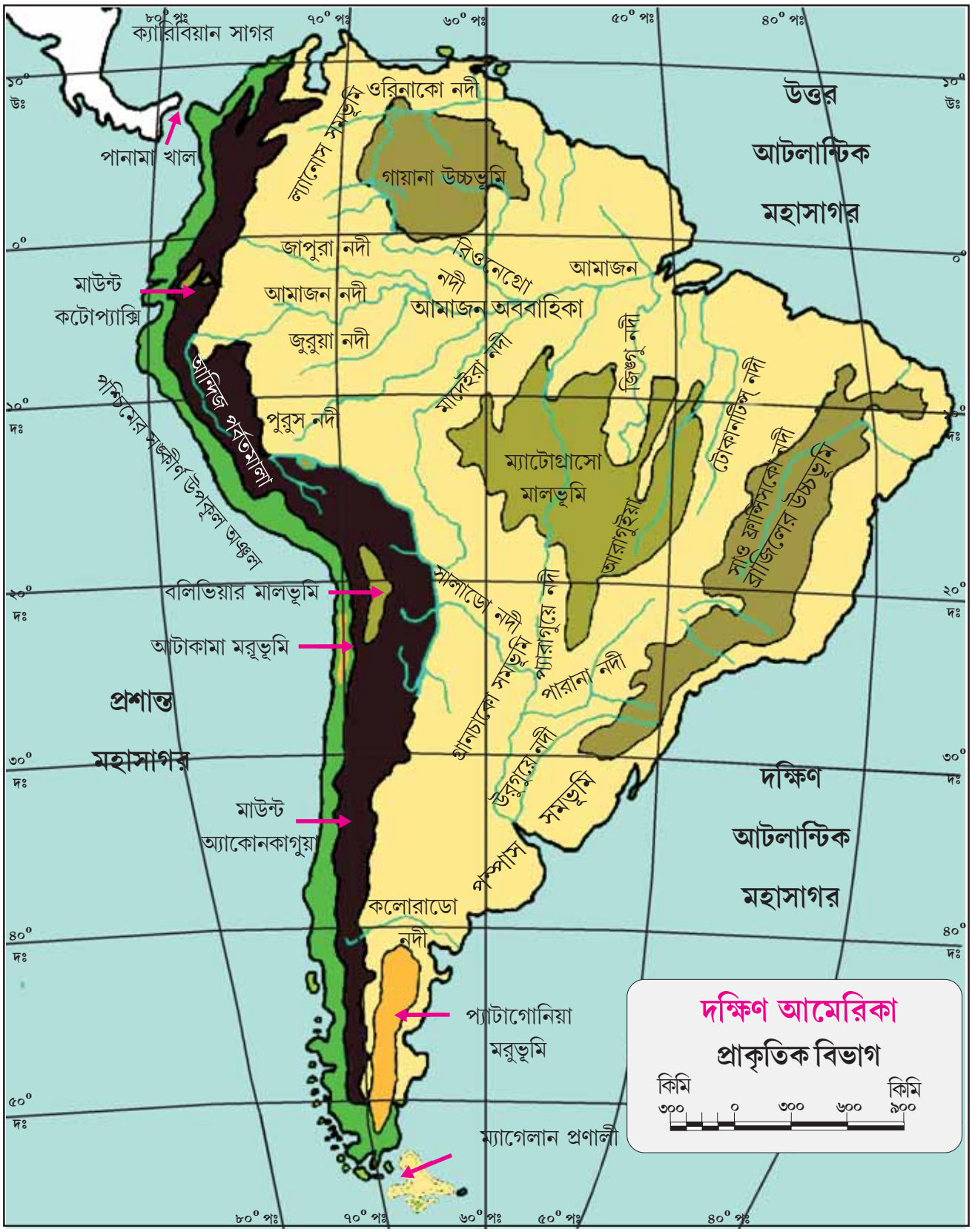

দক্ষিণ আমেরিকা
প্রাকৃতিক বিভাগ
কিমি
কিমি
৩০০
০
৩০০
৬০০
৯০০
ক্যারিবিয়ান সাগর
পানামা খাল
ওরিনাকো নদী
ল্যানোস সমভূমি
গায়ানা উচ্চভূমি
উত্তর
আটলান্টিক
মহাসাগর
জাপুরা নদী
রিওনেগ্রো
নদী
আমাজন
আমাজন নদী
আমাজন অববাহিকা
মাউন্ট
কটোপ্যাক্সি
জুরুয়া নদী
মাদেইরা নদী
জিঙ্গু নদী
টোকানটিন্স নদী
আন্দিজ পর্বতমালা
পুরুস নদী
পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূল অঞ্চল
ম্যাটোগ্রাসো
মালভূমি
আরাগুইয়া
সাও ফ্রান্সিসকো নদী
ব্রাজিলের উচ্চভূমি
বলিভিয়ার মালভূমি
পিলকোমায়ো নদী
প্যারাগুয়ে নদী
আটাকামা মরুভূমি
গ্রানচাকো সমভূমি
পারানা নদী
প্রশান্ত
মহাসাগর
উরুগুয়ে নদী
সমভূমি
মাউন্ট
অ্যাকোনকাগুয়া
দক্ষিণ
আটলান্টিক
মহাসাগর
পম্পাস
কলোরাডো
নদী
প্যাটাগোনিয়া
মরুভূমি
ম্যাগেলান প্রণালী
৮০° পঃ
৭০° পঃ
৬০° পঃ
৫০° পঃ
৪০° পঃ
১০° উঃ
০°
১০° দঃ
২০° দঃ
৩০° দঃ
৪০° দঃ
৫০° দঃ

✷ **দলে আলোচনা করে নীচের সারণিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রে চিহ্নিত করো ও সারণিটি পূরণ করো।**

দক্ষিণ আমেরিকার যে দিকে অবস্থিত	স্থলভাগ / জলভাগের নাম
উত্তরে অবস্থিত খাল	
উত্তরে অবস্থিত মহাসাগর	
পূর্ব প্রান্তের অন্তরীপ	
দক্ষিণ প্রান্তের অন্তরীপ	
দক্ষিণ-পূর্বের মহাসাগর	

একনজরে নদী

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের নদীগুলি হলো— আমাজন (৬৪০০ কিমি দীর্ঘ)। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা। এছাড়াও অন্যান্য নদীগুলি হলো ওরিনোকো, পারানা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে প্রভৃতি। প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ের মিলিত প্রবাহ সৃষ্টি করেছে লা-প্লাটা নদী। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী।

নদীগুলির বিশেষত্ব

- অধিকাংশ নদীগুলি আন্দিজ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে আটলান্টিকে মহাসাগরে পতিত হয়েছে।
- নদীগুলি বৃষ্টির জল ও বরফগলা জলে পুষ্ট তাই নিত্যবাহী।
- এই মহাদেশের বেশিরভাগ নদীই দীর্ঘ ও সুবিশাল অববাহিকাযুক্ত।
- প্রত্যেকটি নদীই মিষ্টি জল বহন করে।
- দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ নদী উত্তর কিংবা পূর্ববাহিনী।
- প্রশস্ত মোহনা, খরস্রোতা নদীর জল ও শক্তিশালী সমুদ্রস্রোতের কারণে ওরিনোকো ছাড়া অন্য কোনো নদীর মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি।

দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ উত্তর গোলার্ধে আবার দক্ষিণাংশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তাই মহাদেশটির উত্তরে ও দক্ষিণে বিপরীতধর্মী জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর
আটলান্টিক মহাসাগর
সাভানা জলবায়ু
(ল্যানোস তৃণভূমি)
নিরক্ষরেখা
০°
পার্বত্য জলবায়ু
ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ
নিরক্ষীয় জলবায়ু ও
সেলভা অরণ্য
সাভানা জলবায়ু
(ক্যাম্পোস তৃণভূমি)
ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু
ও কাঁটা জাতীয়
উদ্ভিদ
উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু ও
ক্রান্তীয় মিশ্র বনভূমি
২৩° ১/২ দঃ
সাভানা জলবায়ু
(গ্রানচাকো তৃণভূমি)
মকরক্রান্তি রেখা
দক্ষিণ
প্রশান্ত মহাসাগর
নাতিশীতোষ্ণ মরু জলবায়ু এবং কাঁটা ও মরু
জাতীয় উদ্ভিদ
নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও
নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি
(পাম্পাস)
দক্ষিণ
আটলান্টিক মহাসাগর
ভূমধ্যসাগরীয়
জলবায়ু ও
স্বাভাবিক উদ্ভিদ
শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু ও
মিশ্র বনভূমি
দক্ষিণ আমেরিকা
জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ
কিমি
৩০০
০
৩০০
৬০০
৯০০
কিমি

তবে দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের মূল কারণগুলি হলো—

- **অক্ষাংশগত অবস্থান** — উত্তরাংশে নিরক্ষরেখার (০°) অবস্থান মহাদেশটির ৯০% স্থানকে উষ্ণ-আর্দ্র নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত করেছে। আবার মধ্যমাংশে মকরক্রান্তিরেখা (২৩° ৩০′ দক্ষিণ)-র অবস্থান নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর সৃষ্টি করেছে।
- **সমুদ্র থেকে দূরত্ব** — উপকূল অংশে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে।
- **সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা** — মহাদেশটির উঁচু পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে উচ্চতার কারণে উষ্ণমণ্ডলেও শীতল জলবায়ু বিরাজ করে।
- **সমুদ্রস্রোতের প্রকৃতি** — মহাদেশটির পূর্বদিকে উষ্ণ ব্রাজিল স্রোতের প্রভাবে উষ্ণ ও পশ্চিম দিকে শীতল পেরু স্রোতের প্রভাবে শীতল জলবায়ু বিরাজ করে।
- **বায়ুপ্রবাহ ও পার্বত্য বাধা** — দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু আন্দিজ পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে এই পর্বতের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। সেখানে আটাকামা মরু জলবায়ু দেখা যায়।

একনজরে জলবায়ু অঞ্চল ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক ও বন্টন

- **নিরক্ষীয় জলবায়ু** — মহাদেশটির উত্তরাংশে **নিরক্ষীয় জলবায়ুতে** আমাজন নদীর অববাহিকায় ঋতুবৈচিত্রহীন উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে রোজউড, আয়রনউড, ব্রাজিলনাট জাতীয় চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়।
- **সাভানা জলবায়ু** — গায়ানা ও ব্রাজিলের উচ্চভূমিতে উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্ম ও শীতল শুষ্ক জলবায়ুতে মূলত লম্বা ঘাসের সাভানা তৃণভূমি ও পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায়।
- **উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু** — ব্রাজিলের পূর্বাংশে ক্রান্তীয় মিশ্র বনভূমি দেখা যায়।
- **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু** — মধ্য চিলিতে আর্দ্র শীত ও শুষ্ক গ্রীষ্ম অঞ্চলে ক্যাকটাসজাতীয় উদ্ভিদ ও ফলমূল জন্মায়।

বিশেষ কথা

কুইটোকে চির বসন্তের দেশ বলা হয়।

- **শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু** — চিলির দক্ষিণে সমভাবাপন্ন প্রকৃতির এই জলবায়ুতে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচীর মিশ্র অরণ্য দেখা যায়।
- **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু** — উষ্ণ গ্রীষ্মযুক্ত আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের উত্তর-পূর্বে প্রায় সমভাবাপন্ন জলবায়ু পম্পাস তৃণভূমির ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি সৃষ্টি করেছে।
- **নাতিশীতোষ্ণ মরু জলবায়ু** — মরুপ্রায় শীতল প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলে কাঁটাজাতীয় গাছ ও ঝোপঝাড় সৃষ্টি হয়েছে।
- **পার্বত্য জলবায়ু** — আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে নীচুস্থানে পর্ণমোচী ও উঁচু অংশে ঘাস, লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

✸ **নীচের তথ্যগুলির সাপেক্ষে উপযুক্ত জলবায়ু কিংবা উপযুক্ত স্বাভাবিক উদ্ভিদের নাম লেখো এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মানচিত্রে তা চিহ্নিত করো।**

ক. একটি শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চল যা সাভানা জলবায়ুতে নিরক্ষরেখার উত্তরে সৃষ্টি হয়েছে _____

খ. উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ুতে যে বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে _____

গ. সাভানা জলবায়ুতে সৃষ্ট তৃণভূমি যার উপর দিয়ে মকরক্রান্তি রেখা প্রসারিত _____

ঘ. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে যে তৃণভূমি সৃষ্টি হয়েছে _____

ঙ. শীতল সামুদ্রিক জলবায়ুতে যে বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে _____

চ. অ্যালপাইন সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী উদ্ভিদ যে জলবায়ুতে দেখা যায় _____

ছ. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে যে বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে _____

জ. মকরক্রান্তি রেখার উত্তরে কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ যে জলবায়ুতে জন্মায় _____

ঝ. নাতিশীতোষ্ণ মরু জলবায়ুতে যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্মায় _____

ঞ. সাভানা জলবায়ুতে সৃষ্ট তৃণভূমি যার উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে যথাক্রমে নিরক্ষরেখা ও মকরক্রান্তি রেখা প্রসারিত _____

- নিরক্ষরেখা ও মকরক্রান্তি রেখাকে মানচিত্রে চিহ্নিত করো।

মনে রাখা জরুরি :

- **অন্তরীপ** — স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রসারিত কোনো দেশ বা মহাদেশের সম্মুখ ভূখণ্ড।
- **লাতিন আমেরিকা** — দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে একসাথে লাতিন আমেরিকা বলা হয়।
- **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল** — জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বতে বাধা পেয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু পর্বত অতিক্রম করে অনুবাত ঢালে পৌছালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। ফলে পর্বতের অনুবাত ঢালে আর বিশেষ বৃষ্টি হয় না। পর্বতের প্রায় বৃষ্টিহীন এই অনুবাত ঢালকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে।

তোমরা এই বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির 'দক্ষিণ আমেরিকা' অধ্যায়ে আরও বিশদে সেলভা অরণ্য, পম্পাস অঞ্চল সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম নদী অববাহিকা যুক্ত যে নদীটি নিরক্ষরেখা বরাবর সম্প্রসারিত তা হল —

(ক) উরুগুয়ে (খ) ওরিনোকো (গ) আমাজন (ঘ) লা-প্লাটা।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ ক্যাম্পোস তৃণভূমি _____ জলবায়ুতে দেখা যায়।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
২.৩.১	প্যাটাগোনিয়া	১. তৃণভূমি
২.৩.২	সেলভা	২. মরুভূমি
২.৩.৩	ল্যানোস	৩. বৃষ্টি অরণ্য

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ নাতিশীতোষ্ণ মরু জলবায়ুতে কি ধরনের উদ্ভিদ জন্মাতে পারে?

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ দক্ষিণ আমেরিকার উদাহরণ সহযোগে ভূমির উচ্চতা ও জলবায়ুর সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ আমাজন নদী দ্বারা পৃথক পূর্বাংশের দুই উচ্চভূমির মধ্যে তিনটি তুলনা উপস্থাপন কর।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫.১ দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী উপাদানগুলির ভূমিকা বর্ণনা কর।

৬. দক্ষিণ আমেরিকার রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপযুক্ত প্রতীকের সাহায্যে চিহ্নিত করো।

৬.১ আমাজন নদী

৬.২ প্যাটাগোনিয়া মরুভূমি

৬.৩ আটলান্টিক মহাসাগর

৬.৪ প্রশান্ত মহাসাগর

৬.৫ মকরক্রান্তি রেখা

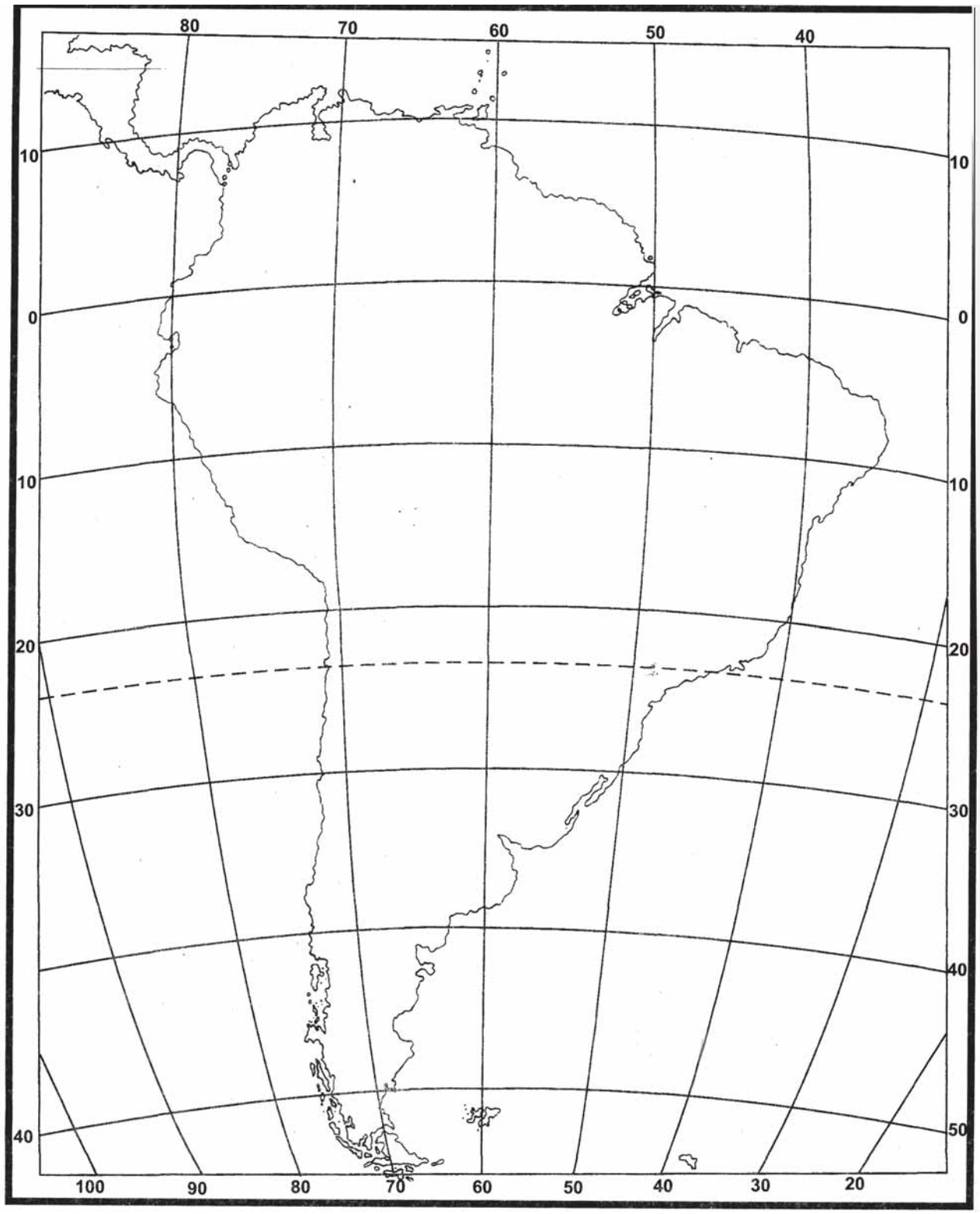

নমুনা প্রশ্নপত্র ৩

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে সংযুক্ত করে রেখেছিল যে সংকীর্ণ ভূখন্ড তা হলো —

(ক) বেরিং প্রণালী (খ) পানামা যোজক (গ) পানামা খাল (ঘ) পানামা সিটি।

১.২ উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির পশ্চিমদিকে থাকা পর্বতগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে দক্ষিণে অবস্থিত —

(ক) আলাস্কা রেঞ্জ (খ) কোষ্ট পর্বত (গ) ব্রুকস রেঞ্জ (ঘ) সিয়েরানেভাদা পর্বত।

১.৩ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কোন পর্বতশৃঙ্গটি আলাস্কা পর্বতে অবস্থিত ও এই মহাদেশের সর্বোচ্চ স্থান—

(ক) মাউন্ট লোগান (খ) মাউন্ট ম্যাককিনলে (গ) মাউন্ট এলবার্ট (ঘ) ব্ল্যাঙ্ক পিক।

১.৪ পঞ্চহ্রদের মধ্যে বৃহত্তম মিষ্টিজলের হ্রদ হলো —

(ক) মিচিগান (খ) হিউরন (গ) সুপিরিয়র (ঘ) অন্টারিও।

১.৫ যে নদী উত্তর আমেরিকার দক্ষিনদিকে পাখির পায়ের ন্যায় বদ্বীপ সমভূমি সৃষ্টি করেছে তা হলো—

(ক) মিসিসিপি-মিসৌরী (খ) সেন্টলরেন্স (গ) টেনেসি (ঘ) কলোরাডো।

১.৬ প্রাচীন শিলাখন্ড দ্বারা গঠিত উচ্চমাল ভূমি যা হাডসন উপসাগরকে কেন্দ্র করে অবস্থিত তা হলো—

(ক) নিউ ইংল্যান্ড উচ্চভূমি

(খ) কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল

(গ) ব্রাজিল উচ্চভূমি অঞ্চল

(ঘ) গায়ানা উচ্চভূমি অঞ্চল।

১.৭ পঞ্চহ্রদ অঞ্চলের যে নদীটি অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল ও লরেন্সীয় মালভূমি অঞ্চলকে আলাদা করে দিয়েছে তা হলো—

(ক) মিসিসিপি-মিসৌরী (খ) কলোরাডো (গ) সেন্টলরেন্স (ঘ) ম্যাকেঞ্জি।

১.৮ তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে প্রবল তুষারপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তৈগা জলবায়ুর উদ্ভিদগুলি—

(ক) নরম ধরনের (খ) শঙ্কু আকৃতির (গ) চাঁদোয়া সৃষ্টি করে (ঘ) কাঁটাযুক্ত হয়ে থাকে।

১.৯ নীচের যে মরুভূমিটিতে নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির জলবায়ু বিরাজ করে তা হলো —

(ক) সোনোরান (খ) প্যাটাগোনিয়া (গ) সাহারা (ঘ) থর।

১.১০ পৃথিবীর যে অরণ্য অ্যানাকোন্ডা সাপ, ট্যারেন্টুলা মাকড়সা, মাংসাশী পিঁপড়ে, রক্তচোষা বাদুড়সহ ভয়ঙ্কর দুর্ভেদ্য কাঁটা ঝোপঝাড় ও জঙ্গলে ভরা তা হলো—

(ক) সাভানা (খ) সেলভা (গ) তুন্দ্রা (ঘ) তৈগা।

১.১১ ''আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলটি অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ''- এর মূল কারণ হলো—

(ক) অত্যধিক উচ্চতা

(খ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের অন্তর্গত

(গ) সমুদ্রতীরে অবস্থান

(ঘ) অত্যন্ত ধ্বসপ্রবণ।

১.১২ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের যেদিকে পার্বত্য বাধার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে কোনো নদী পতিত হতে পারেনি সেই দিকটি হলো —

(ক) উত্তরদিক (খ) দক্ষিণদিক (গ) পূর্বদিক (ঘ) পশ্চিমদিক।

১.১৩ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ুতে প্রভাব সৃষ্টিকারী যে সমুদ্র স্রোতটি পূর্ব উপকূলে ধাক্কা দেয় তা হলো —

(ক) শীতল পেরুস্রোত (খ) উষ্ণ পেরুস্রোত (গ) উষ্ণ ব্রাজিল স্রোত (ঘ) শীতল ব্রাজিল স্রোত।

১.১৪ নীচের যে জলবায়ু অঞ্চলে রোজউড, আয়রনউড জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাতে পারে তা হলো —

(ক) পার্বত্য জলবায়ু (খ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু (গ) মরু জলবায়ু (ঘ) নিরক্ষীয় জলবায়ু।

১.১৫ নীচের যে জোড়াটির মধ্যে মিল নেই —

(ক) দক্ষিণ আমেরিকা—আমাজন

(খ) উত্তর আমেরিকা—পঞ্চহ্রদ

(গ) দক্ষিণ আমেরিকা—আন্দিজ

(ঘ) উত্তর আমেরিকা—ম্যাটোগ্রাসো মালভূমি।

১.১৬ ''আমি উত্তর আমেরিকার সুদীর্ঘ মরু পথে অবস্থিত। আমার দৈর্ঘ্য ৪৪৬ মিটার, আমি প্রায় ১৮০০ মিটারের অধিক গভীরতা যুক্ত পৃথিবীর গভীরতম ক্যানিয়ন।'' — আমি কে?

(ক) মৃত্যু উপত্যকা (খ) গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (গ) কর্ডিলেরা (ঘ) মরু সাগর।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেখতে জলপ্রপাতটির নাম হলো _____।

২.১.২ উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলকে এককথায় _____ বলে।

২.১.৩ উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে বসন্তের শুরুতে যে উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ _____ পর্বতের পূর্বঢালের বরফ গলিয়ে দেয় তা চিনুক নামে পরিচিত।

২.১.৪ যে মহাদেশটির দক্ষিণ দিকে কুমেরু মহাসাগর অবস্থিত তা হলো _____ ।

২.১.৫ দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে থাকা দীর্ঘ-শুষ্ক ও খরাপ্রবণ মরুভূমিটির নাম হলো _____ ।

২.১.৬ মধ্য চিলির আর্দ্র-শীতল ও শুষ্ক-গ্রীষ্ম যুক্ত জলবায়ু অঞ্চল _____ জলবায়ু অঞ্চল নামে পরিচিত।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ ঘাস ও লাইকেন জাতীয় শৈবাল জন্মায় আন্দিজ পর্বতের উচ্চ অঞ্চলে।

২.২.২ দক্ষিণ আমেরিকার বেশীরভাগ নদীই রকি পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

২.২.৩ ভারতের চেয়ে প্রায় পাঁচগুন বড়ো প্রায় ত্রিভুজের মতো আকৃতির মহাদেশ হলো দক্ষিণ আমেরিকা।

২.২.৪ সমুদ্র উপকূলগুলিতে আরামদায়ক চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে।

২.২.৫ পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় অরণ্যের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় উত্তর আমেরিকার লরেন্সীয় জলবায়ুতে।

২.২.৬ নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে উত্তর আমেরিকার পঞ্চহ্রদসমূহ।

২.৩ **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ সামুদ্রিক দূরত্ব হ্রাস করেছে	১. টিটিকাকা
২.৩.২ দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ তৃনভূমি হলো	২. গ্রিনল্যান্ড
২.৩.৩ অ্যাপালেশিয়ান পর্বতের উঁচুস্থান	৩. পানামা খাল
২.৩.৪ পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ হলো	৪. টেনেসি নদীতে
২.৩.৫ দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমের সর্বোচ্চ পর্বত বেষ্টিত মালভূমি হলে	৫. পম্পাস
২.৩.৬ বিশ্বের বৃহত্তম নদী উপত্যকা পরিকল্পনা দেখা যায়	৬. মাউন্ট মিচেল (২০৩৭ মি)

২.৪ **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :**

২.৪.১ আকৃতি অনুসারে উত্তর আমেরিকাকে দেখতে কিসের মতো লাগে?

২.৪.২ উত্তর আমেরিকার একটি পশ্চিমবাহিনী নদীর নাম লেখো যা প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হয়েছে?

২.৪.৩ উত্তর আমেরিকার কোন তৃণভূমি ও জলবায়ুতে আলফা-আলফা ঘাসের প্রাধান্য দেখা যায়?

২.৪.৪ পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে কে কোন মহাদেশ আবিষ্কার করেন?

২.৪.৫ ঋতুবৈচিত্র্যহীনতা কোন জলবায়ুর মুখ্য বৈশিষ্ট্য?

২.৪.৬ আন্দিজ পর্বতের অবস্থানটি উল্লেখ করো।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ সমুদ্র থেকে দূরত্ব কোনো মহাদেশের জলবায়ুকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

৩.২ উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক সীমাসুরক্ষা কিরূপ?

৩.৩ উত্তর আমেরিকার বিখ্যাত কর্ডিলেরাটির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৩.৪ লা-প্লাটা নদীটি কোন নদীগুলির সম্মিলিত প্রবাহ?

৩.৫ হর্ন অন্তরীপ কী?

৩.৬ বরফখাদক কাকে বলে ও কেন?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ উত্তর আমেরিকার কর্ডিলেরা সৃষ্টির কারণ দুটি লেখো।

৪.২. সৃষ্টির আলোকে বিশ্ববিখ্যাত পঞ্চহ্রদের পরিচয় দাও।

৪.৩. উত্তর আমেরিকার পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্বের উচ্চভূমির মধ্যে অন্তত তিনটি তুলনা উপস্থাপন করো।

৪.৪ ''জলবায়ুর পরিবর্তনে অক্ষাংশগত অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম'' — উক্তিটির যথার্থতা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সাপেক্ষে বিচার করো।

৪.৫ দুই আমেরিকা মহাদেশের সাপেক্ষে চিরহরিৎ উদ্ভিদ ও মরু উদ্ভিদের তিনটি বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লেখো।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ সমভূমি সৃষ্টিতে নদনদীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগের সমভূমি সম্পর্কে ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করো।

৫.২ ''স্বাভাবিক উদ্ভিদের বণ্টনে ও বিকাশে জলবায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম'' — উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আলোকে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৫.৩. ''ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি অঞ্চল ও পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল বৈপরীত্য প্রকৃতির'' — বক্তব্যটি উদাহরণের আলোকে বর্ণনা করো।

৫.৪. জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের মুখ্য নিয়ন্ত্রকগুলির ভূমিকা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাপেক্ষে বর্ণনা করো।

৬. পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপযুক্ত প্রতীকের সাহায্যে চিহ্নিত করো ঃ

৬.১ আমেরিকার উত্তরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ।

৬.২ উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে অবস্থিত দীর্ঘতম পর্বত।

৬.৩ উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম পাখির পায়ের ন্যায় গঠিত বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চল।

৬.৪ হাডসন উপসাগরের চর্তুদিকে থাকা বিখ্যাত শিল্ড অঞ্চল।

৬.৫ উত্তরের সরলবর্গীয় অরণ্য ও তৈগা জলবায়ু অঞ্চল।

৬.৬ দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি অঞ্চল।

৬.৭ পৃথিবীর দীর্ঘতম পার্বত্য অঞ্চল।

৬.৮ দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় মধ্যভাগে সুউচ্চ মালভূমি অঞ্চল।

৬.৯ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাকে পৃথক করেছে যে বিখ্যাত খাল।

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬